সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০২১

একুশে ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান পরিচালনা ভারতের

ভারত আবার বিশ্বে বৃহত্তম টিকাকরন অভিযান পরিচালনা করছে। এপর্যন্ত ২১ দিনে ৫০ লাখ লোককে টিকা প্রদান করা হয়েছে। এটি দ্রুততম টিকাপ্রদানের অনন্য নিজর। ভিডিওতে দেখুন বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং কর্মকর্তারা ভারতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং তাদের ভ্যাকসিন নেয়ার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন।

মুম্বইয়ে সিনেমার জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি মুম্বাইয়ে অবস্থিত সিনামার জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তিনি একে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস সংরক্ষনের চমৎকার জাদুঘর বলে আখ্যায়িত করেন

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৯ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭ | ফেব্রুয়ারি ২০২১

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাতদিন
পৃষ্ঠা ৩৭-৪০

সম্পাদক
নান্টু রায়
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: inf4.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ • গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১১-৬২৪২৪৪

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

সূচিপত্র

সৌহার্দ — দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ॥ নেপালকে ট্রানজিট দিতে ভারতীয় রেলওয়ের উপ-আঞ্চলিক সংযুক্তি ০৪

এয়ারোইন্ডিয়া-২০২১-য় বাংলাদেশ বিমান বাহিনির চিফ অফ এয়ার স্টাফ ॥ কলকাতায় তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ॥ ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাবে সম্মানিত দুই বাঙালিকে অভিনন্দন ০৫

কুমিল্লায় তৃতীয় ভারত-বাংলাদেশ সমন্বিত চেক পোস্ট/স্থল কাস্টমস স্টেশন অবকাঠামো সংক্রান্ত উপ-কমিটির বৈঠক ॥ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোবার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন ০৬

'আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী' রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ০৭

উত্তরণ — কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ০৮

সাক্ষাৎকার — কোভিড-১৯-এর টিকা প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এবং নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সদস্য ড. ভি কে পলের সঙ্গে টিকার যাত্রাপথ নিয়ে সাক্ষাৎকার ১০

উন্নয়ন — প্রবাসী ভারতীয়রা এখন ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রদূত ১২

পর্যটন — করোনাকালীন বিশ্ব পর্যটন দিবসে ভারতের নানা আয়োজন ১৫

শ্রদ্ধাঞ্জলি — ঈশ্বরের সেবক সীমান্ত গান্ধী ১৭

বাণী অর্চনা — বিদ্যা-মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতিমা ॥ কুশলবরণ চক্রবর্তী ২০

স্মরণ — ভাষা-শহিদ আবুল বরকত মুর্শিদাবাদের সন্তান ॥ ঈমাম হোসাইন ২২

কবিতা — আনন্দমোহন রক্ষিত ॥ শেখ নজরুল ॥ মিতুল সাইফ ২৪
গোলাম কিবরিয়া পিনু ॥ প্রণব মজুমদার ॥ আঁখি বিশ্বাস ২৫

প্রতিযোগিতা — আমার কাছে স্বাধীনতা মানে ॥ রানা মজুমদার ২৬

ছোটগল্প — মধুপ-কাহিনি ॥ রহিমা আক্তার কল্পনা ২৮
মুনশী আবদুল হাকিমের কোট ॥ সালেহা চৌধুরী ৩৩

ভ্রমণ — আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাতদিন ॥ ড. বেলারাণী সরকার ৩৭

ধারাবাহিক — কেউ কেউ পায় ॥ অনিন্দিতা গোস্বামী ৪১

হেঁসেলঘর — ভোজনরসিকদের স্বর্গ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৪৬

শেষ পাতা — যাঁদের মনে রাখিনি... ৪৮

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা

গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ

আমরা ভারত বিচিত্রার গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করছি। যেসব গ্রাহক ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে চান, তাঁরা নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখুন বা inf4.dhaka@mea.gov.in-এ ই-মেইল পাঠান। ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে, অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। – সম্পাদক

গ্রাহক ও লেখক যথাক্রমে ইংরেজিতে নিচের তথ্যসমূহ পূরণ করে চিঠি বা লেখা পাঠান:

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Routing No :.....
e-mail :.....

চিঠিপত্র

ব্যথা বাবা এখনো ভুলতে পারেননি

ছোটবেলায় আমার ম্যাগাজিন পড়া শুরু হয়েছিল বাবার সংগ্রহের ভারত বিচিত্রা দিয়ে। সেই তখন থেকেই ভারতীয় মানুষ ও সংস্কৃতির প্রতি আমার ভাল লাগা শুরু।

অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে অনেক দিন আমাদের বাড়িতে মুদ্রিত ভারত বিচিত্রা পৌছায়নি, যার ব্যথা বাবা এখনো ভুলতে পারেননি।

আমাদের বাড়িতে একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার আছে। যেখানে পাড়ার শিশু, বৃদ্ধ সকলে আসে। বয়োবৃদ্ধরা ভারত বিচিত্রার স্মৃতি এখনো ভুলতে পারে না। আবার তাদের পক্ষে অনলাইনে পড়াও অসম্ভব। সম্পাদক মহোদয়ের কাছে সকলের অনুরোধ, নিচের ঠিকানায় যেন মুদ্রিত ভারত বিচিত্রা পাঠানো হয়। সকলে চির কৃতজ্ঞ থাকবে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অটুট থাকুক।

মো. ফাহিম ফয়সাল
গ্রাম: ডাক্তার পাড়া (ওয়ার্ড- ০৩, ওয়ারেছিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন), ডাক- বদরগঞ্জ (৫৪৩০)
উপজেলা: বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর

সস্তার তিন অবস্থার ব্যাখ্যা কোথায়?

সস্তার তিন অবস্থা। কথাটা কে বলেছে, জানি না। তবে আমার মনে হয়, নিশ্চয় তিনি একজন ভারত বিচিত্রার অন্যতম পাঠক ছিলেন। আর বিনামূল্যে ভারত বিচিত্রা পাবার সঙ্কট ও সমস্যার কারণে এ উক্তিটি করে থাকবেন। আমি আমার পাঠাগার থেকে রংধনু পাঠাগার নামে আরেকটা পাঠাগারে যাই ভারত বিচিত্রা পড়তে। কিন্তু সেখানেও পত্রিকা নিয়মিত পৌছায় না। সারা বছরে ২/৩টি সংখ্যা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ডাক বিভাগের প্রতিও খুব একটা আস্থা রাখা চলে না। আমার বিশ্বাস *ভারত বিচিত্রা* ছাড়া ডাকে আর কোন চিঠিপত্র কারো নামে আসে না। এতদিনে নিশ্চয় এ দেশের ডাক বিভাগ জেনে গেছে যে, এ পত্রিকাটি টাকায় কেনা নয়; তাই ঠিক সময়ে অথবা না-পৌছালেও গ্রাহকের ক্ষতি নেই। সুকান্তের রানার হয়তো জানে না– মূল্যবোধ মূল্য দিয়ে কেনা যায় না। পৃথিবী জুড়ে আর কোন পত্রিকা বিনামূল্যে বিলি করা হয় কিনা আমার জানা নেই।

যদি দাম দিয়ে কেনা হতো এবং তা রেজিস্টার্ড ডাকে বিলি করা হতো তাহলে এমন সমস্যা থাকতো না। সবার মধ্যে জবাবদিহিতা থাকতো। আমাকেও বার বার পত্রিকার জন্য আবেদন পাঠাতে হতো না। আমি পত্রিকার জন্য ২৮/১০/২০১৭ তারিখে ও ২৫/৮/২০১৯ তারিখে দুবার মেইল করে আবেদন দিয়েছি, কোন কাজ হয়নি। আজ তৃতীয় বার আবেদন করছি। পূর্বের আবেদন দুটো সংযুক্ত করলাম। পত্রিকার প্রয়োজন নেই, লেখাটা যেন পাঠক পাতায় ছাপা হয়। সস্তার তিন অবস্থা। কিন্তু এই গুরুতর তিন অবস্থার ব্যাখ্যা পাই কোথায়?

নূর মোহাম্মদ মিয়া সম্পাদক
গীতিকার তৌহিদ-উল ইসলাম পাঠাগার
ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম

সবিনয় অনুরোধ

আমি ১৯৮৪ সালের দিকে *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক হই। গ্রাহক নম্বর ছিল ২১৫৫০। চাকরিতে বদলি-জনিত কারণে, ১৯৮৭ সালের পর পত্রিকাটির প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হই। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে করতে ৫০ টির মত সংখ্যা অতিরিক্ত সংগ্রহ হয়ে গেছে। ২০০০-২০১৫ পর্যন্ত ভারত বিচিত্রা বছরওয়ারী বাঁধাই করে ব্যক্তিগত সংগ্রহে এনেছি। ২০১৪ সালে চাকরি থেকে অবসরের পর এখনোও পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে পত্রিকাটি সংগ্রহ করি।জানুয়ারী ২০২০ সংখ্যায় আপনারা নতুন

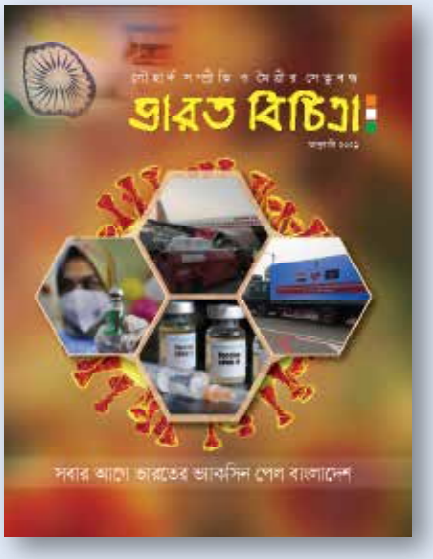

গ্রাহক করছেন জেনে আমাকে গ্রাহক করে নেবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

মুজিবুর রহমান খন্দকার
অব. সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল, বগুড়া
ঠিকানা: মালতিনগর, বগুড়া

কারণ কী?

ভারত বিচিত্রা অ-নে-ক আবেদন করা সত্ত্বেও পাচ্ছি না। কারণ কী? প্রত্যাশা করছি– এখন থেকে *ভারত বিচিত্রা* পাব।

ফারিয়া খানম মুমু, সভাপতি
গন্তব্য শ্রোতা সংঘ, ইমামপুর রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ-১৫১২

দ্বিতীয় ভারত-বাংলাদেশ কনস্যুলার সংলাপে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০বছর পূর্তি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা

নতুনদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভারত-বাংলাদেশ কনস্যুলার সংলাপে ভারতের পক্ষে সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও বাংলাদেশের পক্ষে রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস্ নেতৃত্ব দেন। সংলাপে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে দুই দেশের জনগণের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ কনস্যুলার বিষয়াদি স্থান পায়

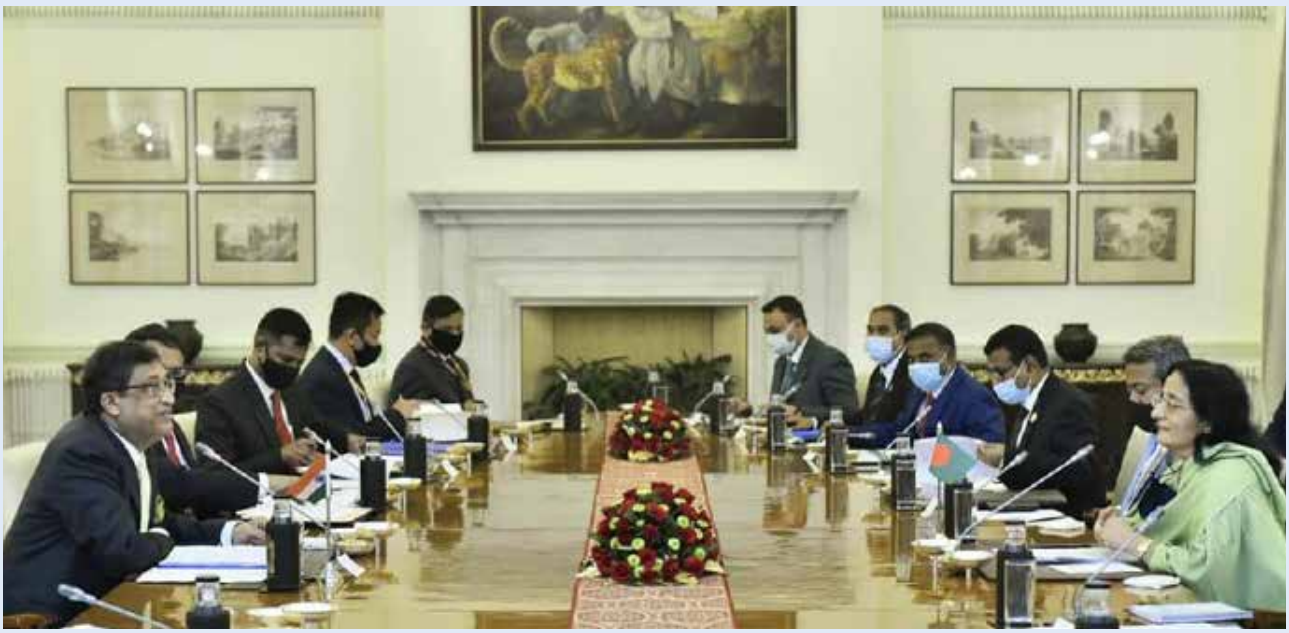

সম্পাদকীয়

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ত্রিধাবিভক্তির একদিন পরেই বাংলার দুই প্রধান নেতা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হয়তো কমিউনিস্টদের মতই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বিষণ্নচিত্তে ভেবেছিলেন, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। এক গবেষক বলছেন, ১৫ আগস্ট বিকেলেই ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন। কেন এমনটা ভেবেছিলেন বাংলার দুই নেতা? তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, যে স্বাধীনতা তাঁরা লাভ করেছেন, তা জনগণের নয় কোনওমতেই, সে-স্বাধীনতা ঢাকা-কেন্দ্রিক কিছু মুসলিম লীগারের পশ্চিমা পাক-শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হালুয়া-রুটি ভাগ করে খাওয়ার বন্দোবস্তমাত্র। কারণ, পাকিস্তান সৃষ্টিতে যাঁদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দুই নেতাকেই সুকৌশলে রাখা হয়েছে ক্ষমতা-বলয়ের বাইরে, যেন তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয়, যেন দেশ ও জনসাধারণের ভালমন্দ নিয়ে তাঁদের ভাববার আর প্রয়োজন নেই, যেন তাঁদের প্রয়োজন ছিল শুধু হিন্দুদের পরিবর্তে পশ্চিমা মুসলিম নেতা (আরও পরিষ্কার করে বললে পঞ্জাবি) ও তাদের সেবাদাস পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগারদের ক্ষমতায় বসানো– যেহেতু উপমহাদেশের ভাগাভাগি শেষ, এখন আর তাঁদের প্রয়োজন নেই। অথচ পাকিস্তান প্রস্তাব শুধু নয়, ভারত-বিভক্তিতে বাংলার এই দুই নেতারই ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই তাঁদের একপাশে সরিয়ে রেখে ক্ষমতার পাশাখেলা শুরু হয়ে গেল।

ভগ্নহৃদয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরলেন শেখ মুজিব। ঢাকায় শামসুল হক ছিলেন, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদের মত ছাত্রনেতারা। কলকাতা থেকে ফিরে এসব ছাত্রনেতার সঙ্গে বসলেন পূর্ববাংলার সেই ডাকসাইটে ছাত্রনেতা, যিনি রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত জাঁদরেল নেতার কাছে, যার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং কৃষক-প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হক। যিনি ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর প্রিয় পার্শ্বচর, হয়ে উঠেছিলেন প্রিয়তম শিষ্য, সেই শেখ মুজিবের ডাকে সবাই সমবেত হলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্র টেবিলে রেখে ছাত্রনেতারা সবিস্ময়ে দেখলেন, পাকিস্তানের জন্মেই গোলমাল রয়ে গেছে। পুবে-পশ্চিমে বারোশো মাইলের ব্যবধানে এক পাকিস্তানের চিন্তা করাটাই ছিল যে মস্ত ভুল, সেটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এ ভুলের সংশোধন হতে পারত সমন্বয়ের ক্রমাগত চিন্তায়। কিন্তু তা না করে, পাকিস্তানের শাসকচক্র বিভেদের মন্ত্রই শুধু উচ্চারণ করতে লাগলেন। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাঁরা মস্তবড় এক ফাঁকিতে পড়ে গেছেন।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে পুলিশের গুলিতে যখন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে, তখন শেখ মুজিব জেলে। সেখান থেকেই আন্দোলনের খবর নিচ্ছেন তিনি, দিচ্ছেন প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। একশ্রেণীর অতিবাম বুদ্ধিজীবী দীর্ঘদিন যাবত ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদানকে উপেক্ষা করে একপেশে ভাষ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অপনোদনে মুজিবদুহিতাকেই কলম ধরতে হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কথা বলতে হয়েছে। সত্য এমনই অমোঘ যে, একদিন তা প্রকাশিত হয়ই। আজ সত্য সামনে এসেছে।

বাহান্নর সোপান বেয়ে একাত্তরে সেই ভুলের সংশোধন হল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে, যা সেদিনকার ছাত্রনেতারা বুঝতে পেরেছিলেন। 'ঝুটা আজাদি' সত্য করতে মাসুল দিতে হল তিরিশ লক্ষ প্রাণ, সম্ভ্রম গেল দুই লক্ষ মা-বোনের। একুশ থেকেই স্বাধিকারের প্রেরণা এসেছিল, তাই একুশ এত তাৎপর্যপূর্ণ বাংলার বাঙালির কাছে।

দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব

৩০ জানুয়ারি ২০২১ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব এএমবি মাসুদ বিন মোমেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ ভার্চুয়ালি শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি খুব শিগগিরই বাংলাদেশের ঢাকা ও অন্যান্য নগরীতে প্রদর্শিত হবে। এ প্রদর্শনী দুই দেশের অভিন্ন রক্তপাত ও আত্মত্যাগের প্রদর্শনী। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)-র জীবন ও কর্ম আজও লক্ষ-কোটি মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। ভারত ও বাংলাদেশে প্রদর্শনের পর এটি জাতিসংঘে প্রদর্শিত হবে। পরে ২০২২ সালে কলকাতায় এ প্রদর্শনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। ● সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নেপালকে ট্রানজিট দিতে ভারতীয় রেলওয়ের উপ-আঞ্চলিক সংযুক্তি

বাংলাদেশ থেকে নেপালে ট্রানজিট সুবিধা দিতে ভারতীয় রেলওয়ে উপ-আঞ্চলিক বিবিআইএন সংযুক্তির প্রসার ঘটিয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে রোহনপুর-সিংহাবাদ রেল ট্রানজিট রুটে ভারতীয় রেলওয়ের ৪২ বিসিএন ওয়াগনভর্তি সিমেন্ট নেপালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে

এয়ারোইন্ডিয়া-২০২১-য় বাংলাদেশ বিমান বাহিনির চিফ অফ এয়ার স্টাফ

'এয়ারোইন্ডিয়া-২০২১' চলাকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনির চিফ অফ এয়ার স্টাফ মসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এয়ারোইন্ডিয়া শোতে বাংলাদেশের বিমানবাহিনিপ্রধান এলসিএ তেজস চালনা করেন। বেঙ্গালুরুতে এলসিএ তেজস থেকে নেমে মি. সেরনিয়াবাত একে 'একটি অসাধারণ ফ্লাইট' বলে বর্ণনা করেন (উপরের ছবি)

কলকাতায় তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশ সচিব শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা কলকাতায় তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাবে সম্মানিত দুই বাঙালিকে অভিনন্দন

ভারত সরকার ও ভারতবাসীর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা পদক পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (অব.) বীর প্রতীক এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সনজীদা খাতুনকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। লে. কর্নেল জহিরের মত বীরের সম্মান প্রাপ্তি যুবকদের যেমন বিশেষভাবে অনুপ্রণিত করে, তেমনি সনজীদা খাতুনের সম্মানপ্রাপ্তি বাংলার সারস্বতশ্রেণিকে উৎসাহিত করেছে। ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের স্বনামধন্য সংগীতবিৎ সনজীদা খাতুন ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থারও প্রতিষ্ঠাতা। • সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুমিল্লায় তৃতীয় ভারত-বাংলাদেশ সমন্বিত চেক পোস্ট/স্থল কাস্টমস স্টেশন অবকাঠামো সংক্রান্ত উপ-কমিটির বৈঠক

৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারত-বাংলাদেশ সমন্বিত চেক পোস্ট/স্থল কাস্টমস স্টেশন অবকাঠামো সংক্রান্ত উপ-কমিটির বৈঠকে বিবিরবাজার-শ্রীমন্তনগর এবং বিলোনিয়া-মুহুরিঘাট অবকাঠামো উন্নয়ন কাজসহ বিদ্যমান বন্দর অবকাঠামো সুবিধা, স্থলবন্দর/সমন্বিত চেক পোস্ট/স্থল কাস্টমস স্টেশনসমূহে কোয়ারেন্টাইন সুবিধা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সীমানার ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়ন কাজ নির্মাণ, নতুন বন্দর অবকাঠামোর উন্নয়ন, স্থলবন্দরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্দর কর্মকর্তাদের যৌথ প্রশিক্ষণ, বন্দর কার্যক্রমের সময়-সমন্বয় এবং বন্দর কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অবকাঠামো উন্নয়নসংক্রান্ত উপ-কমিটির পরবর্তী বৈঠক চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ● সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোবার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোবার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ে তাঁর বীরত্ব ও অবদান প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে অফুরান অনুপ্রেরণার উৎস। পূর্বাঞ্চলীয় সেনা অধিনায়ক হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে স্থলবাহিনিকে সংগঠিত করা ও নেতৃত্বদানের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক পরাজয় স্বীকার করে। জয় বাংলা।

‘আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী’ রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় ‘আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সহযোগিতায় ইয়ুথ অপরচুনিটিস আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় সারাদেশ থেকে সহস্রাধিক লেখা জমা পড়ে। বিদেশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি তরুণরাও এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমদ পলক। প্রতিযোগিতায় মিডিয়া পার্টনার ছিল *ডেইলি স্টার* ও *ডিবিসি নিউজ*, কমিউনিটি পার্টনার ছিল *প্রথম আলো* বন্ধুসভা।

প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি তরুণদের সৃজনশীলতা প্রদর্শনের প্ল্যাটফর্ম দেওয়া এবং ‘স্বাধীনতা’ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও তাদের কাছে এ শব্দের অর্থ উপস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া। প্রতিযোগিতায় দু’টি বিভাগে লেখা গ্রহণ করা হয়, বিভাগভিত্তিক বিজয়ীরা হলেন:

ক বিভাগ– বাংলা

- চ্যাম্পিয়ন: আফসারা তাসনিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রথম রানার আপ: ফারসিয়া কাওসার চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- দ্বিতীয় রানার আপ: রানা মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- চতুর্থ: তিলক সাহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- পঞ্চম: কায়কোবাদ মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ষষ্ঠ: রুবাইদ আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
- সপ্তম: মোছা. তানজিলা আকতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ বিভাগ– ইংরেজি

- চ্যাম্পিয়ন: মালিহা মমতাজ ঐশী, ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- প্রথম রানার আপ: ইপ্সিতা কাজুড়ী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
- দ্বিতীয় রানার আপ: মানস চন্দ্র হালদার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, জামসেদপুর, ভারত
- চতুর্থ: ফাকিহা ইয়াসমিন, ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়
- পঞ্চম: মো. ইসমাইল মোর্শেদ, ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- ষষ্ঠ: মো. আফতাহী ইসলাম নয়ন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
- সপ্তম: প্রত্যাশা ঘোষ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

উভয় বিভাগের চ্যাম্পিয়নরা পুরস্কার হিসেবে ল্যাপটপ এবং অন্যরা স্মার্টফোন দেওয়া হয়। এছাড়া সকল বিজয়ীকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও বই উপহার দেওয়া হয়। উভয় বিভাগের শীর্ষ রচনাসমূহ *ভারত বিচিত্রায়* প্রকাশিত হবে।

- সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উত্তরণ

কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। এ প্রতিবেদন যখন তৈরি হচ্ছে, ততদিনে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে টিকাগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ প্রথমদিকে টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেকেই বিচলিত ছিলেন। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখানে পত্রস্থ হল।

প্রত্যেককে কি একইসঙ্গে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হবে?

টিকা পাওয়ার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সরকার, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেছে বিশেষ গোষ্ঠীকে, যাদের বেশি ঝুঁকি আছে, তাদের টিকা দেওয়া হবে। প্রথম গোষ্ঠীতে আছে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামনের সারিতে থাকা কর্মীরা। দ্বিতীয় যে গোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হবে, সেটি হল ৫০ বছরের বেশি বয়সী এবং ৫০ বছরের কম কিন্তু অন্যান্য অসুখ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের।

টিকা নেওয়া কি বাধ্যতামূলক?

কোভিড-১৯-এর টিকা নেওয়া স্বেচ্ছামূলক। তবে নিজের জন্য এবং রোগ সংক্রমণ রুখতে টিকা নেবার পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশ টিকাদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদি আমি বলি এটাই কোভিড-১৯-এর শেষের শুরু, তাহলে বাড়াবাড়ি হবে না। তবু আমি সব মানুষের কাছে কোভিড বিধি পালনের আবেদন রাখব। – ডা. হর্ষবর্ধন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ভারত সিদ্ধান্তমূলক কাজ করেই চলেছে এবং কোভিড-১৯ অতিমারীকে শেষ করার সংকল্প প্রকাশ করছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ টিকা প্রস্তুতকারক হিসেবে তারা তা করার উপযুক্তও বটে। যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে আমরা সব জায়গায় অতিদুঃস্থদেরও সুরক্ষায় কার্যকর নিরাপদ টিকাদান নিশ্চিত করতে পারব। – টেডরস অ্যাডহানম ঘেবড়িয়েসাস, মহানির্দেশক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছেন এমন ব্যক্তির কি টিকা নেওয়া জরুরি?

হ্যাঁ, এতে রোগের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ার সাহায্য হবে।

যাদের কোভিড-১৯ সংক্রমণ আছে বা সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদেরও কি টিকা নিতে হবে?

সংক্রমিত ব্যক্তি অথবা সংক্রমিত হয়েছে বা সন্দেহ করা হচ্ছে এমন ব্যক্তি টিকাদান কেন্দ্রে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, তাই সংক্রমিত ব্যক্তিকে টিকা নিতে হবে, উপসর্গ কমে যাওয়ার ১৪ দিন পরে।

কম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা এবং প্রয়োগ হয়েছে, তাই এই টিকা কি নিরাপদ?

দেশে যে টিকা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার সুরক্ষা এবং কার্যকারিতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছে।

অনেকগুলি টিকা পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কোনটা বেছে নেওয়া হবে?

টিকা প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে সুরক্ষা এবং কার্যকারিতার তথ্য পরীক্ষা করে তবেই লাইসেন্স অনুমোদন করেছে ড্রাগ রেগুলেটর অফ ইন্ডিয়া। সেই জন্য যে সমস্ত কোভিড ১৯ টিকা লাইসেন্স পেয়েছে, তাদের তুল্যমূল্য সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা আছে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, টিকাদান প্রক্রিয়ায় একই ধরনের টিকা একজনকে ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

নাম লেখানোর সময় ফটো আইডি কি প্রয়োজনীয়?

নথিভুক্তির সময়ে পেশ করা ফটো আইডি, টিকা নেওয়ার সময় দেখাতেই হবে।

যদি কোনও ব্যক্তি টিকাদান কেন্দ্রে ফটো আইডি দেখাতে না পারেন, তাহলে কি তাকে টিকাদান কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে না?

নথিভুক্তির সময় এবং টিকাদান কেন্দ্রে প্রাপকের পরিচয় জানতে ফটো আইডি বাধ্যতামূলক।

ভারতে যে টিকা দেওয়া হচ্ছে, তা কি অন্য দেশের টিকার মতই কার্যকরী?

হ্যাঁ, ভারতের কোভিড-১৯ টিকা অন্যান্য দেশের যে-কোনও টিকার মতই কার্যকরী। এর সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাকসিনের ট্রায়াল হয়েছে।

কি করে জানতে পারব আমি টিকা নেওয়ার যোগ্য?

যোগ্য সুবিধা প্রাপকদের তাদের মোবাইল নম্বারের মাধ্যমে টিকাদান কেন্দ্র এবং টিকা দেওয়ার সময় সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা করা হবে নথিভুক্তি এবং টিকাদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করতে।

টিকা দেওয়ার তারিখ সম্পর্কে প্রাপক জানবেন কি করে?

অনলাইন নথিভুক্তির পরে প্রাপকরা তাদের নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে টিকা দেওয়ার তারিখ, স্থান এবং সময় সম্পর্কে এসএমএস পাবেন।

যদি কোনও ব্যক্তি ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির জন্য ওষুধ খান, তাহলে তিনি কি টিকা নিতে পারবেন?

হ্যাঁ, এক বা একাধিক অসুস্থতা নিয়েও কোভিড-১৯ টিকা নেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ অথবা সংযোগ ছাড়াই হিমঘর ব্যবস্থার যাবতীয় দিক সুনিশ্চিত করা হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই যে সমস্ত হিমঘর রয়েছে সেগুলির পরিকাঠামো আরও মজবুত করতে প্রথমেই বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশে ইতিমধ্যে ৪টি বড় স্টোর আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৩৫টি স্টোর আছে। কিন্তু সরকার নিশ্চিত করেছে, যে প্রত্যেকটি রাজ্যে বাধ্যতামূলকভাবে যেন একটি বড় ভ্যাকসিন স্টোর থাকে। এই জন্য সরকার ৩৫টি স্টোরকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করছে। প্রথম শ্রেণির স্টোরের পাশাপাশি এবং সব মিলিয়ে ৬০টি এরকম স্টোর তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, টিকাদান কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য ওয়াক ইন কুলার, ডিপ ফ্রিজার, আইস লাইন্ড রেফ্রিজারেটর পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ২০২১-এর ১৪ই জানুয়ারির মধ্যে টিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে।

দেশে তৈরি টিকা কমদামী এবং কার্যকর হবে

উৎপাদক	দাম	তাপমাত্রা
কোভিশিল্ড (ভারত)	২০০	২-৮ ডিগ্রি
কোভ্যাক্সিন (ভারত)	২০৬	২-৮ ডিগ্রি
ফাইজার (অনেক দেশে ব্যবহার হচ্ছে)	১৪৩১	-৭০ ডিগ্রি
মডার্না	২৭০০	২-৮ ডিগ্রি
সিনোফার্ম (চিন)	৫৬৫০	২-৮ ডিগ্রি
সায়ানোওয়েক বায়োটেক (চিন)	১০২৭	২-৮ ডিগ্রি
নভাভ্যাক্স	১১১৪	২-৮ ডিগ্রি
স্পুটনিক-ভি (রাশিয়ার গামালিয়া সেন্টার)	৭৩৪	২-৮ ডিগ্রি
জনসন অ্যান্ড জনসন	৭৩৪	২-৮ ডিগ্রি

দাম– টাকায়, যখন ভারতে তৈরি হবে, তখন দামের তফাৎ হবে

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত: নেওয়া হচ্ছে যথাযথ পদক্ষেপ

- যখন প্রধানমন্ত্রী ২০২০-র ২৪ মার্চ লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন, ভারতে তখন প্রায় ৫০০জন করোনার রোগী ছিলেন।
- যখন লকডাউন ঘোষণা হয়, তিন দিনে সংক্রমণ দ্বিগুণ হয় এবং সংক্রমণ বাড়তে থাকে ১৯.৬ শতাংশ হারে।
- লকডাউন রূপায়ণে দেরি হলে কোনও কাজই হত না। ওটাই এমন সময় যখন, সংক্রমণের ঢেউ সাধারণ মানুষের বহুলাংশে আক্রমণ করত।
- সরকারের কাছে সেটাই ছিল চ্যালেঞ্জ। এটাই ছিল অতিমারীর মোকাবিলায় পরিকাঠামো গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়।
- করোনা ভাইরাস অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে লকডাউনের সময় ব্যবহার করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় ১৫,৩৬২টি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, প্রায় ১৫.৪০ লক্ষ আইসোলেশন শয্যা, ২.৭০ লক্ষ অক্সিজেনসহ শয্যা এবং ৭৮,০০০ আইসিইউ শয্যা তৈরি করা হয়।
- সরকারি হাসপাতালগুলিকে দেওয়া হয় ৩২,৪০০টি ভেন্টিলেটর। ঐ সময় হাসপাতালগুলিতে মাত্র ১২,০০০ ভেন্টিলেটর ছিল।
- রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয় ৩.৭০ কোটি এন ৯৫ মাস্ক এবং ১.৬০ কোটি পিপিই কিট।

আরও চারটি টিকা নিয়ে ভারতে কাজ হচ্ছে

জাইডাস ক্যাডিলা:
আমেদাবাদের এই সংস্থা ২০২০-এর ডিসেম্বরে ট্রায়াল সম্পূর্ণ করেছে। এখন তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে।

স্পুটনিক ভি:
রাশিয়ার গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজির তৈরি স্পুটনিক-ভি টিকার তৃতীয় পর্বের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অনুমোদন করেছে ডিসিজিআই। হায়দ্রাবাদের ড. রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ ভারতে এই ট্রায়াল চালাচ্ছে।

বায়োলোজিক্যাল ই:
হায়দ্রাবাদে এই সংস্থা একটি প্রোটিনভিত্তিক টিকা বানাচ্ছে। বিই টিকা তৈরি হচ্ছে আমেরিকার বেলর কলেজ অফ মেডিসিনের সহযোগিতায় এবং চলছে প্রথম পর্বের ট্রায়াল। এটির দ্বিতীয় পর্বের ট্রায়াল শুরু হবে ২০২১-এর মার্চে।

জেনোভা:
পুণের জেনোভা বায়োফার্মাসিউটিক্যালসও মানুষের ওপর ট্রায়ালের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটি একটি এমআরএনএ কোভিড-১৯ টিকা। প্রথম পর্বের ট্রায়াল চলছে। দ্বিতীয় পর্বের ট্রায়াল ২০২১-এর মে-র মধ্যে হতে পারে।

কখন অ্যান্টিবডি তৈরি হবে?
সাধারণত কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে ২ সপ্তাহে অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ স্তর গড়ে ওঠে।

টিকাদান কেন্দ্রে কি কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন?
কোভিড-১৯ টিকা নেওয়ার পরেই টিকাদান কেন্দ্রে অন্তত আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও অসুবিধা বা অস্বস্তিবোধ হয়, তাহলে তা স্বাস্থ্য কর্মীকে জানাতে হবে।

আমাদের সুরক্ষা, দেশের সুরক্ষা
টিকা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেবে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমাবে। অন্য টিকার তুলনায় ভারতের টিকা কার্যকরী এবং কম দামী। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর প্রধান ড. ভি কে পল জানিয়েছেন, 'এটি অত্যন্ত নিরাপদ টিকা, প্রায় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, কোনও ঝুঁকির সম্ভাবনা নেই; টিকা নেওয়ার পর সামান্য ক্লান্তি বোধ হতে পারে ও ব্যাথা লাগতে পারে কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা টিকা নেব এবং আমাদের এবং দেশকে বাঁচাব।' ভারত করোনার বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হেনেছে প্রধানমন্ত্রীর ৫টি প্রধান নীতি অবলম্বন করে– মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; নির্বাচনে বুথ স্তরের কাজের ব্যবহার এবং গণটিকা কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা; বৈজ্ঞানিক এবং নিয়ন্ত্রক বিধি মেনে চলা, যাতে চলতি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যহত না হয় এবং আইটিনির্ভর প্রচার চালানো। করোনার প্রতিষেধ টিকা আবিষ্কৃত হবার মানে এই নয় যে, করোনা বিদায় নিয়েছে বা নিচ্ছে। আমাদের প্রতিনিয়ত এই ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, করোনার মত মহামারী আবারও হানা দিতে পারে। • সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

সাক্ষাৎকার

কোভিড-১৯-এর টিকা প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এবং নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সদস্য ড. ভি কে পলের সঙ্গে টিকার যাত্রাপথ নিয়ে সাক্ষাৎকার:

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে বৃহত্তম টিকাদান কর্মসূচী শুরু হয়েছে। টিকা তৈরির পর টিকাদান, প্রটোকলকে অগ্রাধিকার দান এবং নির্বাচনের সময়ে বুথের ধরনে টিকাদান ব্যবস্থাপনা তথা টিকার যাত্রাপথ নিয়ে *নিউ ইন্ডিয়া সমাচার*-এর কনসাল্টিং এডিটর সন্তোষকুমার কথা বলেন কোভিড-১৯-এর টিকা প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এবং নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সদস্য ড. ভি কে পলের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ:

এত বড় অতিমারী এবং টিকা তৈরি নিয়ে সরকারের প্রাথমিক ভাবনা কি রকম ছিল?
অতিমারীর সময় ভারতের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এপ্রিল মাসেই একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয় এবং তার ওপর টিকার জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক সমাধান খোঁজার এবং তার জন্য উপযুক্ত সুবিধা তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। জাতীয় গবেষণাগারগুলির বৈজ্ঞানিক এবং টিকা প্রস্তুতকারী শিল্পের মানুষদের একসঙ্গে উৎসাহ দেওয়া হয়। যখন টিকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সরকার অর্থ এবং সম্পদ দিয়ে সাহায্য করে।
শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল, দেশেই টিকা আবিষ্কার এবং তৈরি করা। আমরা সাফল্য পেয়েছি এবং আরও চারটি টিকা ট্রায়াল পর্বে আছে। ভবিষ্যতে নতুন অনেক টিকা তৈরি হবে এবং চলতি টিকাগুলির উৎপাদনও বাড়বে।

দেশে টিকা তৈরির যাত্রাপথে কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল?
চ্যালেঞ্জ থাকলেও আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা নিয়ে। ফলাফল এখন সকলের সামনে।

এত বড় পরিকাঠামো বিশেষ করে টিকার জন্য কোল্ড চেন কিভাবে তৈরি হল?
দেখুন, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের টিকা দেওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে ভারতের। প্রতি বছর ৬৫ কোটির বেশি টিকা দেওয়া হয় ৯০ লক্ষের বেশি পর্যায়ে। কোল্ড চেন সুবিধা অনেকটাই

আমাদের দুটি ভ্যাকসিনই অত্যন্ত নিরাপদ। এব্যাপারে প্রচুর তথ্য রয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এটি একটি বিশাল কাজ। সাফল্য ও কার্যকারিতার ভিত্তিতে আমরা এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছি। চলতি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা আরও অনেক কিছু বুঝতে পারব। আমাদের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে আমরা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আরও এগিয়ে যেতে পারব।

ছিল যা বাড়ানো হয়েছে বর্তমান প্রয়োজন মত। টিকাদান কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আইটি প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে তৃণমূল স্তরে পরিকাঠামো এবং কোল্ড চেন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুবিধাপ্রাপকদের চিহ্নিত করতে, টিকা দেওয়ার স্থান এবং সময় নির্ধারণে এবং মানুষের বিশ্বাস রাখতে একই প্রযুক্তি ব্যবস্থা করা হবে।

কোল্ড চেনের সংখ্যা বাড়াতে আর কি করা হয়েছে?

আপনি যদি কোল্ড চেনের প্রসার নিয়ে বলেন, আমাদের চারটি বড় এবং প্রায় ৩৫টি দ্বিতীয় শ্রেণির মেডিকেল ডিপো– সব মিলিয়ে মোট ৩৯টি। নতুন কয়েকটি ব্যবস্থা করে এখন দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপো তৈরি করা হচ্ছে প্রথম শ্রেণির মতই। এরকম কোল্ড স্টোরে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০টিতে। এর অর্থ প্রথম শ্রেণির সংখ্যায় বেড়ে হয়েছে ৬০। এর পর ২৯,০০০ হাজারের বেশি কোল্ড চেন পয়েন্ট থাকবে, যা ব্যবহৃত হবে টিকা দানের সময়।

টিকার জন্য প্রাথমিক গোষ্ঠী মনোনয়নের বিষয়ে অথবা একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি কি আরও কিছু যোগ করতে চান?

আমাকে বলতে হয় যে, টিকাদান অভিযান শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে কারণ তাদেরই সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি। তারা অন্যকে বাঁচাতে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন নিরাপদ এবং উৎসাহী স্বাস্থ্যকর্মী, এর পরে সামনের সারিতে থাকা কর্মীদের পালা। তারপর ৫০-এর বেশি বয়সী ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া হবে। এর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পরিকল্পনা হচ্ছে, বুথ লেবেলের নির্বাচনের মত যেমন মানুষ বুথে গিয়ে ভোট দেয়, তেমনই টিকা দেওয়া হবে। টিকাদানের পরে নজরও রাখা হবে এবং মানুষকে অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মনে করিয়ে দেওয়া হবে।

প্রত্যেকের টিকা দেওয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ, সরকার কিভাবে এর মোকাবিলা করবে?

এত বড় মাপের টিকাদান অভিযান, সত্যিই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রায় ৩০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হবে প্রথম পর্বে। আরও বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া প্রয়োজন হবে। টিকার সংখ্যা এখনও কম।

পরবর্তী পর্যায় কবে নাগাদ শুরু হতে পারে?

প্রায় সাত-আট মাস লাগবে ৩০ কোটি লক্ষ্যে পৌঁছতে। আরও বেশি সংখ্যায় টিকা পাওয়া গেলেই টিকাদান কর্মসূচীও আরও দ্রুত গতিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনন্য নজির স্থাপন করেছে, এসত্ত্বেও সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনও মতানৈক্য বা ঘাটতি রয়েছে কি?

না, এখানে কোনও পার্থক্য নেই। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতিতে ঐকমত্যের ক্ষেত্রেও কোনও মতানৈক্য নেই। প্রত্যেকবারই টিকাকরণের বিষয়ে সাধারণ মতামতগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা একসঙ্গে টিম ইন্ডিয়া রূপ ধারণ করে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও এই সমন্বয় অব্যাহত থাকবে।

টিকাকরণে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কি হবে?

এখনই টিকাকরণের খরচের ব্যাপারে আলোচনা করা ঠিক হবে না। বর্তমানে খুব অল্পসংখ্যক টিকা ক্রয় করা হয়েছে; আমরা ভবিষ্যতে আরও টিকা সংগ্রহ করব। কেবল টিকা সংগ্রহের জন্যই খরচ করা হচ্ছে না। টিকাকরণ সংক্রান্ত প্রচার, সচেতনতা অভিযান, টিকাকরণের সিরিঞ্জ প্রভৃতি খাতেও খরচ করা হচ্ছে। তাই, বিরাট এই কর্মযজ্ঞে একাধিক খাতে খরচ হচ্ছে। তবে সমগ্র টিকাকরণ খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের কোনও ঘাটতি থাকবে না, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং টিকা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টা হু-সহ অন্যান্য দেশ প্রশংসা করেছে। একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি এটিকে কিভাবে দেখছেন?

করোনোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের সাফল্যে আমি অত্যন্ত খুশি। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একেবারে শুরুর দিকে রোগীদের জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড ও পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সময় আমাদের পর্যাপ্তসংখ্যক পিপিই কিট ও ভেন্টিলেটর ছিল না। কিন্তু আমরা এখন এগুলি রপ্তানি করছি। শূন্য থেকে শুরু করে আমরা এখন দৈনিক ১৫ লক্ষের বেশি ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা করতে পারছি। লকডাউনের ফলে সংক্রমণের হার যেমন কমেছে, তেমনই মৃত্যু হারও কমে হয়েছে ১.৪%। • সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ভারতীয় কে কোথায়?

গুগল সিইও সুন্দর পিচাই
মাইক্রোসফট্ সিইও সত্য নাদেল্লা
এডোবি সিইও শান্তনু নারায়ণ
নেটএ্যাপ সিইও টমাস কুরিয়ান
মাস্টারকার্ড সিইও অজয় বাঙ্গা
ডিবিএস সিইও সুরজিৎ সোম
নোভার্টিস সিইও বসন্ত নরসিংহন
ডায়াজিও সিইও ইভান ম্যানুয়েল মেনেজেস
স্যানডিস্ক এক্স-সিইও সঞ্জয় মেহরোত্রা
হারমান সিইও দিনেশ পালিবল
মাইক্রোন সিইও সঞ্জয় মেহরোত্রা
পালো আল্টো সিইও নিকেশ অরোরা
রেকিট বেঙ্কাইসার সিইও লক্ষ্মণ নরসিংহন
আইবিএম সিইও অরবিন্দ্ কৃষ্ণা
ব্রিটেনের চ্যাঞ্চেলর ঋষি সৌনক
ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি সুশীল প্যাটেল
আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভরদকর
আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস

উন্নয়ন

প্রবাসী ভারতীয়রা এখন ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রদূত

প্রবাসী ভারতীয়রা দক্ষতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে ভারতের নাম উজ্জ্বল করছেন। তারা এখন মাতৃভূমির ঋণ মেটাতে বিশেষ আগ্রহী। ষোড়শ প্রবাসী ভারতীয় দিবসে একই সংকল্প নিয়ে তারা এখন *আত্মনির্ভর ভারত* মিশনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন এবং 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র দূত হয়ে উঠেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'এই শতক আপনাদের, কিন্তু একবিংশ শতাব্দী হবে অবশ্যই ভারতের।' তাঁর বাণী গত শতাব্দীতে যথার্থই প্রমাণিত হয়েছে এবং ভারত ক্রমশ সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

এখন ভারতের পরাক্রম বিশ্বজুড়ে সুবিদিত। আর্থিক শক্তিধর দেশ হিসেবেই শুধু নয়, ভারত সামরিক মহাশক্তিধর দেশ হিসেবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ও মহাকাশ ক্ষেত্রে দেশ সাফল্য অর্জন করেছে এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকার *আত্মনির্ভর ভারত* প্যাকেজের জন্য ২৯.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভি আকৃতির আর্থিক পুনরুদ্ধারের দিকে দেশকে সেই সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যখন কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সারা বিশ্ব সঙ্কটের সম্মুখীন।

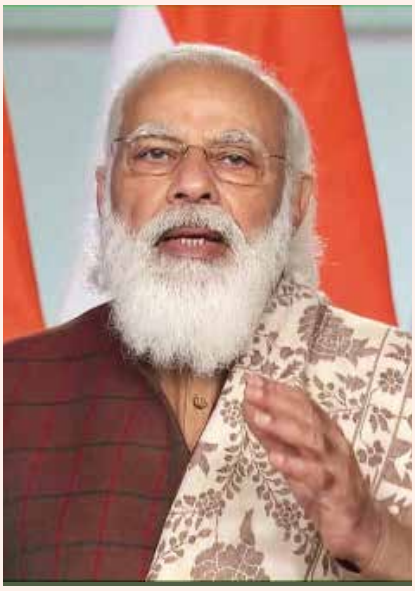

আজ, সারা বিশ্বে ভারতের প্রতি যে আস্থা অর্জিত হয়েছে তার অন্যতম কারণ প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান। যেখানেই আপনারা যান, আপনারা ভারতকে এবং ভারতীয়ত্বকে সঙ্গে নিয়ে যান। ভারত সারা বিশ্বের উপর কখনওই কোনও কিছু চাপিয়ে দেয়নি, কিন্তু আপনারা বিশ্ব জুড়ে যা করেছেন তা হল ভারতের জন্য কৌতূহল ও উৎসাহ তৈরি করেছেন।

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২১-এর প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

- বিশ্বজুড়ে এই মহামারী থেকে ভারত যা শিখেছে সেটি এখন *আত্মনির্ভর ভারত* অভিযানের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- ভারতে উৎপাদিত সামগ্রীগুলি সারা বিশ্বের উপকারে আসছে। ওষুধ নির্মাণ শিল্প ভারতের ক্ষমতার সুফল দেখিয়েছে।
- ভারত যখন আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে ব্যান্ড, তখন ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
- ভারত মানবজাতিকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, একটি নয় দুটি *মেড ইন ইন্ডিয়া* করোনা টিকা তৈরি হয়েছে।
- ভারতের মহাকাশ কর্মসূচী ও প্রযুক্তির নতুন উদ্যোগগুলি সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, উন্নয়নের এই পর্বে প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ষোড়শ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন ২০২১-এ বক্তব্য রাখার সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। ২০২১-এর প্রবাসী ভারতীয় দিবসের মূল ভাবনা 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে সামিল হওয়া।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন ভারত আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার পরিচিতি দৃঢ় করার জন্য আপনাদের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।' যখন কেউ 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁর আশেপাশের লোকদের ওই পণ্যের উপর আস্থা জন্মায়। চা থেকে বস্ত্র অথবা থেরাপি যা কিছু হতে পারে। খাদি এখন বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এর ফলে ভারতের বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যবাহী বৈচিত্র্যও সারা বিশ্বের দুয়ারে হাজির হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ ব্যয়সাশ্রয়ী এবং উন্নত গুণমানের সামগ্রী পাচ্ছেন।

সর্বোপরি প্রবাসী ভারতীয়দের সহায়তা, অভিজ্ঞতা, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের ফলে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর ইতোমধ্যেই তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। সহজে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচক, সহজে ভ্রমণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা অর্জিত হচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণে চারটি নতুন শ্রম কোড, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নত পরিকাঠামো সাহায্য করছে।

ভারতের আত্মনির্ভরতার পিছনে যে শক্তি নিহিত রয়েছে তা হল, 'শত শত হাতে কাজ কর, কিন্তু হাজার হাজার হাতের সঙ্গে ভাগ করে নাও'। লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের কঠোর পরিশ্রমে ভারতে যেসব সামগ্রী উৎপাদিত হবে, তার সুফল পাবে সারা বিশ্ব। ওয়াই টু কে-র সময় ভারতের ভূমিকা বিশ্ব কখনওই ভুলতে পারবে না। ভারত সে-সময় সারা বিশ্বকে চিন্তামুক্ত করেছিল। আবারও ভারত চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

- সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

প্রবাসী ভারতীয় দিবস কি...

দেশের উন্নয়নে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯১৫ সালের এই দিনে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ভারতবাসীর জীবনে চিরস্থায়ী পরিবর্তন এনেছিলেন। ২০০৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেন, তারপর থেকে একইভাবে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপিত হত– এর পর প্রতি দু'বছর অন্তর এই উৎসব পালনের রীতির প্রবর্তন করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বিশেষজ্ঞ, নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ এই সম্মেলনে অংশ নেন– এবারের সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে সামিল হওয়া। • সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

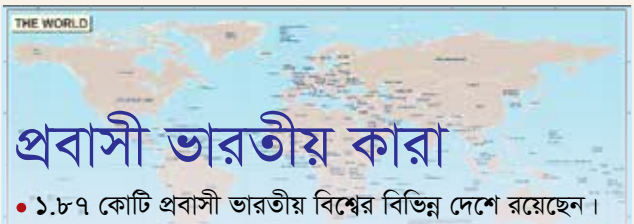

প্রবাসী ভারতীয় কারা

- ১.৮৭ কোটি প্রবাসী ভারতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছেন।
- সারা বিশ্বে ৩.২১ কোটি প্রবাসী ভারতীয় রয়েছেন। বিশ্বের ১৯০টি দেশের জনসংখ্যার থেকেও যা বেশি।
- পার্সনস অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন (পিআইও) হলেন সেইসব ভারতীয় বংশোদ্ভুত যাঁরা ভারতের বাইরে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক।
- ইন্দ্র নূয়ী, সুন্দর পিচাই, সত্য নাদেলা এবং কল্পনা চাওলার মত প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁদের দেশকে গর্বিত করেছেন।
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ৩৪.২০ লক্ষ ভারতীয় রয়েছেন, যাঁরা প্রবাসে বসবাসরত ভারতীয়দের জন্য সম্পর্কের নতুন দিশা দেখাচ্ছেন।
- প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশে যান তখন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার, সিডনির অলফোনস অ্যারেনা, সেসেলস থেকে মরিশাস কিংবা সাংহাই সর্বত্রই প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় বংশোদ্ভুতরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় স্বাগত জানিয়েছেন।
- সরকার পিআইও এবং ওসিআই-এর সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় প্রবাসী ভারতীয়রা স্বাগত জানিয়েছেন।
- ভিসা সংক্রান্ত নিয়মাবলী শিথিল ও সরল করা হয়েছে।

ভারতীয় অভিবাসীরা বিদেশের নেতৃত্বে

রাজনীতি, প্রযুক্তি এবং শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভুতরা গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। ব্রিটেনের সংসদে দাদাভাই নওরোজি প্রথম ভারতীয় সদস্য হয়েছিলেন। এখন কমলা হ্যারিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সুরিনামের রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকাপরসাদ সান্তোখও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত। একইভাবে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ কুমার যুগনাউথ-এর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেলও ভারতীয় বংশোদ্ভুত।

শুধু রাজনীতিই নয়, সুন্দর পিচাই, সত্য নাদেলা, ইন্দ্র নূয়ী, শান্তনু নারায়ণ, অজয় বাঙ্গা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরকাড়া সাফল্য এনে ভারতকে গর্বিত করেছেন। সরকার বিদেশে ভারতকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁদের প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার দিয়ে থাকে।

এবছর নিউজিল্যান্ডের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্কা রাধাকৃষ্ণণ ও মুকেশ আঘিসহ ৩০জন এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি আর্মেনিয়াতে প্রচারের জন্য একটি এনজিওকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, এছাড়াও আজারবাইজানের ড. রজনী চন্দ্র ডিমেলো ওষুধ শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন।

• সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

পর্যটন

করোনাকালীন বিশ্ব পর্যটন দিবসে ভারতের নানা আয়োজন

বাঙালির নাকি পায়ের তলায় সর্ষে! অ-বাঙালিরা এ কথায় গোঁসা করতেই পারেন। কারণ, ঘর ছেড়ে বাইরের টান বাঙালিদের তুলনায় কোনও অংশে কম নয় তাঁদের। তবে করোনাভাইরাসের মত অতিমারীর প্রকোপে বারমুখো হওয়াটা পিছিয়ে যায় বহু ভ্রমণপিপাসুরই। তা সত্ত্বেও, ক্যালেন্ডারের পাতায় এসেছিল ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বিশ্ব পর্যটন দিবস। ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার বিশ্ব জুড়েই চলে নানা অনুষ্ঠান। তবে অতিমারীর আবহে যতটা সম্ভব সে-সব অনুষ্ঠান ঠাঁই নেয় অন্তর্জালের ঘেরাটোপে।

অন্যান্য বছরের মত ২০২০ সালেও ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করে। সেই উপলক্ষে একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে ২৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০– চারদিন ধরে চলে 'পর্যটন পর্ব'। ওই পর্বে ফেসবুক লাইভে গানবাজনা, গল্পবলা থেকে শুরু করে রথযাত্রা, 'কার র‍্যালি', ওয়েবিনার, করোনা-সেফটি কিট বিতরণ, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব পর্যটন দিবসের আগের দিন অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে হয় এর সূচনা। এর পরের কয়েক দিন ধরে সেপ্টেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত চলে নানা অনুষ্ঠান। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে গ্রামীণ উন্নয়নের থিমকে মাথায় রেখে এসব অনুষ্ঠান সাজানো হয়।

একনজরে পর্যটন পর্ব ২০২০-র আয়োজনসমূহ দেখে নেয়া যাক:

২৭ সেপ্টেম্বর

- ইন্ডিয়াট্যুরিজম কলকাতার তরফে ফেসবুক লাইভ, সঙ্গী ছিল জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের ভারতীয় শাখার সাংস্কৃতিক পার্টনার বাংলানাটকডটকম। এতে বক্তা ছিলেন সাগ্নিক চৌধুরী এবং রাজ বসু। অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল বাউলগীতি, রায়বেঁশে নাচ এবং পুতুল তৈরি ও হস্তশিল্প শেখানো।
- শিলিগুড়িতে ছিল গ্রামীণ পর্যটন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।
- ছিল ঘোড়ায় টানা রথের যাত্রা।
- *দেখো আপনা দেশ* প্রচারের অঙ্গ হিসেবে ছিল 'কার র‍্যালি'। ছিল ট্যাবলো যাত্রাও।
- পটনা ও ভুবনেশ্বরে ছিল ওয়েবিনার, পোর্ট ব্লেয়ারে সেমিনার-সহ নানা অনুষ্ঠান।

২৮ সেপ্টেম্বর

- কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) এবং সিটিং ও টাকদহের হোমস্টে অ্যান্ড হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওই এলাকায় কলকাতার ইন্ডিয়াট্যুরিজম শাখা পর্যটন পর্ব উদ্‌যাপন করে। এটিও ফেসবুক লাইভ হয়।
- করোনাভাইরাসের প্রকোপ এড়াতে স্যানিটাইজার, গ্লভস ইত্যাদিও বিতরণ করা হয়।
- ত্রিপুরায় পর্যটনস্থান নিয়ে ছিল ওয়েবিনার।
- ছিল ওড়িশার শিল্প ও সংস্কৃতিবিষয়ক ওয়েবিনারসহ নানা অনুষ্ঠান।

২৯ সেপ্টেম্বর

- ছিল ডুয়ার্সের মালবাজারে অনুষ্ঠান, যা ফেসবুক লাইভ হয়।
- গ্রামীণ পুতুলের গল্প নিয়ে ছিল বাঁকুড়ায় ফেসবুক লাইভ।
- ছিল ওড়িশার রান্না নিয়ে ওয়েবিনার ছাড়াও মিজোরামের পর্যটনস্থল নিয়ে অনুষ্ঠান।

৩০ সেপ্টেম্বর

- আইসিসিআর এবং এসিটি-র পর্যটন পর্ব উদ্‌যাপন।
- বিহারের আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানানো হয় একটি ওয়েবিনারের মাধ্যমে। এ ছাড়াও নানা অনুষ্ঠানে সাজানো ছিল এই পর্ব।

• সংকলিত

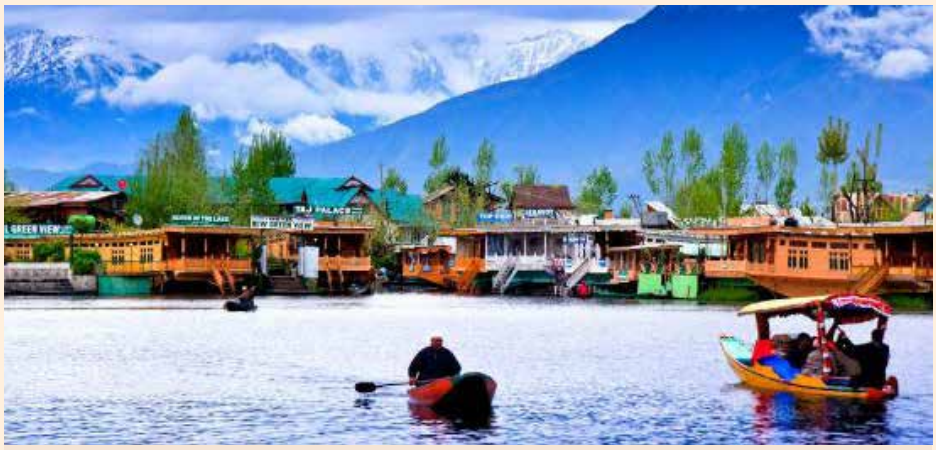

জম্মু ও কাশ্মীরে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা

সরকার *সবকা সাথ সবকা বিকাশ* মন্ত্র নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নকে নতুন গতি দিয়েছে যা অনেক দশক ধরে অবহেলিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীরে শিল্পোন্নয়নের গতিবিধিকে ব্লক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ বছরে সরকার উন্নয়নের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচনকারী প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে ২০২০-২১ থেকে ২০৩৬-৩৭ পরিকল্পনাকালের জন্য মোট ২৮,৪০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে:

- বর্তমান শিল্প পরিকাঠামোয় নতুন বিনিয়োগ এবং প্রতিপালন আকর্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া হয়েছে।
- প্রায় ৪.৫ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান প্রদানের জন্য পরিকল্পিত প্রকল্পগুলিতে অভাবনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে। এই শিল্পায়ন কৃষি, বাগিচা চাষ, রেশম চাষ, মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং ডেয়ারি শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।
- ৫০ কোটি বিনিয়োগ সীমাসম্পন্ন শিল্পোদ্যোগগুলি এই ছাড় পাওয়ার যোগ্য। এই ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা হল 'এ' জোনের ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা আর 'বি' জোনের ক্ষেত্রে ৭.৫ কোটি টাকা।
- উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বছরে ৬% হারে ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট সাবভেনশনের মাধ্যমে ৭ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।
- উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ১০ বছরের প্রকৃত বিনিয়োগে জিএসটি সংযুক্ত ছাড়ের ৩০০% মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সমস্ত চালু শিল্পোদ্যোগ বছরে ৫% হারে পাঁচ বছর পর্যন্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সুদে ছাড় পাবে। এই ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা হল ১ কোটি টাকা।
- বিনিয়োগ গন্তব্যের ক্ষেত্রে জম্মু ও কাশ্মীরের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারের এই সমস্ত উদ্যোগ একটি অনুকূল আবহ গড়ে তুলছে।
- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল জম্মু ও কাশ্মীরকে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

• সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

সিদ্ধান্ত

জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ২৮,৪০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পে ১১২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সুবিধা

নরেন্দ্র মোদি সরকার জম্মু-কাশ্মীরে উন্নয়নের অনেক দরজা খুলে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশীয় পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহ দিতে সরকার উদ্যোগ নেবে যা জম্মু ও কাশ্মীরের পণ্য আমদানির নির্ভরতা হ্রাস করার পাশাপাশি সেই রাজ্যের রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। বৃহৎ এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য নতুন প্রকল্প রচনা করা হয়েছে।

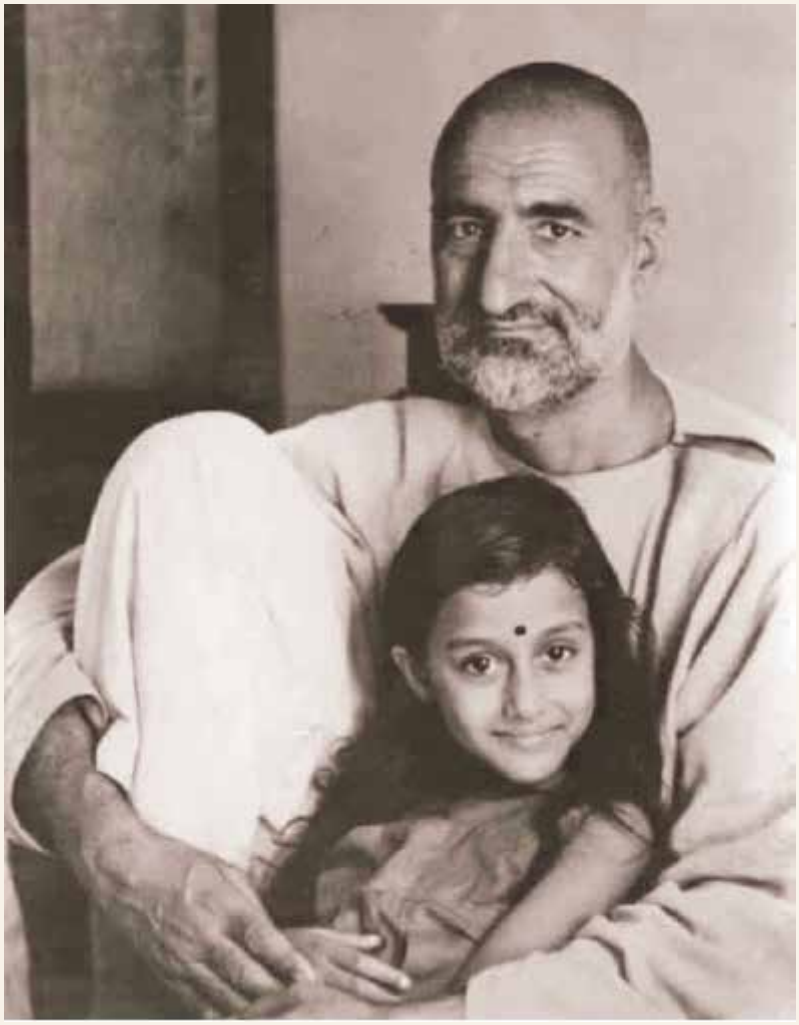

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঈশ্বরের সেবক সীমান্ত গান্ধী

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে বেশিদিন কারাবাস করেছিলেন কে? সঠিক উত্তরটা অনেকেরই অজানা। আর হবে নাই বা কেন, ইতিহাসে তাঁর জন্য বরাদ্দ মাত্র দু'লাইন। তাঁকে নিয়ে না হয়েছে কোনও সিনেমা, না কোনও টিভি সিরিয়াল। অথচ জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর এই মানুষটা কাটিয়েছেন লৌহকপাটের পেছনে, এমনকি স্বাধীনতার পরেও! মানুষটি হলেন অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অবিসংবাদিত নেতা। গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেসের সমর্থক এই মানুষটি বেছে নিয়েছিলেন অহিংস আন্দোলনের পথ। ১৯২৯ সালে ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে শুরু করা অহিংস আন্দোলন দিয়েই শুরু তাঁর রাজনৈতিক জীবন। মনে রাখবেন ওই অঞ্চলের উপজাতি পাখতুন গোষ্ঠীকে অহিংস পথে চালনা করা আর বাঘকে নিরামিষ খাওয়ানো একইরকম। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা নিজেদের বলতেন 'খুদা-ই-খিদমতগার' মানে ঈশ্বরের সেবক। ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের মুকুটহীন বাদশা, দেশের মানুষ আখ্যায়িত করেছিলেন 'সীমান্ত গান্ধী' বলে– এতটাই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা।

অবশেষে ১৯৮৮ সালে পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ সময়েও তিনি পেশোয়ারে গৃহবন্দী ছিলেন। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধিস্থ করা হয় আফগানিস্তানের জালালাবাদে। মৃত্যুর পর হাজারো জনতা সীমান্তের বাধা মানেনি। সেই অগ্নিগর্ভ সময় যখন সেভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার আর সৌদির পয়সায় মৌলবাদ জাঁকিয়ে বসেছে, ফৌজি রক্তচক্ষু ও ইসলামিক জঙ্গিদের হুমকি উপেক্ষা করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন অন্তিম যাত্রায়। শোভাযাত্রায় বোমা বিস্ফোরণ হয়, মারা যান পনেরোজন মানুষ, তবুও সম্মানীয় এই জানাজা আটকানো যায়নি। জনতার এই বেতাব বাদশা মারা যাওয়ার সময় যুদ্ধবিরতি হয় সেভিয়েত অধিকৃত আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে।

আজকের তালিবান আলকায়দা অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মোল্লাতন্ত্র আবাদের চারণভূমিতে তিনি স্থানীয় মানুষদের পুরো উল্টো দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজির লবণ আন্দোলনের সমর্থনে ভাষণ দেবার সময় প্রথম গ্রেফতার হন। প্রতিবাদে যখন তাঁর সমর্থনকারীরা পেশোয়ারের খাওয়ানি বাজার চকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তখন ব্রিটিশ সেনা সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালায়, সৃষ্টি হয় আরেক জালিয়ানওয়ালাবাগ। সরকারি মতে নিহতের সংখ্যা দুশো হলেও প্রকৃত সংখ্যাটা অনেক বেশি। সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে জ্বলে ওঠে বিক্ষোভের আগুন। দমন করতে সেনা নামায় ইংরেজ কিন্তু এলিট রয়্যাল গারোয়াল রাইফেলস্ -এর সেনারা নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি ছুড়তে অস্বীকার করে। মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার।

ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়ের সময়ে জিন্নাহ এবং বাকিদের উস্কানিতে আলাদা মুসলিম ভূখণ্ডের দাবির মাঝে এই মানুষটি অসম লড়াই বেছে নিয়েছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন ওই স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি। তাঁর নেতৃত্বে আফগান এবং পাঠান রক্তের দুর্ধর্ষ উপজাতি মানুষগুলো গণভোট বয়কট করেছিল আর এইখানেই তিনি রাজনৈতিক ভুল করে ফেলেন। ওই গণভোটে দুটো অপশন ছিল, হয় ভারত অথবা পাকিস্তান এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি আর তার অনুগামীরা সিদ্ধান্ত নেন তারা স্বতন্ত্র পাখতুনিস্থান চাইবেন।

স্বাভাবিকভাবেই তাদের দাবি মানা হয়নি, ব্রিটিশ এবং মোল্লা উদ্যোগে এরপর ক্রমাগত ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে পূর্ণ মুসলিম দেশের প্রচার চালিয়ে যাওয়া হয়। সে সময়ের সরকারি রিপোর্ট বলেছে যে ক্রমাগত হিন্দু শাসনের কারণে কি কুফল হতে পারে তার প্রচার চালায় জিন্নাহর দোসররা। একসময়ে সরল ঐ পাহাড়ি মানুষদের মুখিয়ারা এতে প্রভাবিত হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর জেনারেল লর্ড কানিংহ্যামও স্বীকার করেন যে, তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালান যাতে ওই খুদা-ই-খিদমতগার এবং বাদশা খানের প্রভাব দূর করা যায় এবং ওই অঞ্চলকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এরপর সংখ্যালঘু মানুষের রায়ে নবগঠিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল পুন্তন অধ্যুষিত ঐ অঞ্চল। সীমান্ত গান্ধী নতুন দেশের এসেম্বলিতে এলেন ১৯৪৮ সালে, কিন্তু পাখতুনস্থানের দাবি থেকে সরলেন না। আবেদন জানালেন জিন্নাহর কাছে। তিনি জিন্নাহকে আমন্ত্রণ জানালেন পেশোয়ারের খুদা-ই-খিদমতগারের সদর দফতরে আলোচনার জন্য। ততদিনে বিষবৃক্ষের ফলন শুরু হয়ে গিয়েছে। তৎকালীন সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খান আব্দুল কায়ুম খান জিন্নাহকে বোঝালেন যে, এই মানুষটি তাঁকে মারার পরিকল্পনা করেছে। পরের ঘটনা অতীব দুঃখজনক, জিন্নাহ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত কোনও অভিযোগ ছাড়াই তাকে জেলে বন্দি রাখা হয়। স্বাধীনতা চাওয়ার পুরস্কার!

এল ১৯৫৫। পাক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা গণতন্ত্রকে গলা ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক করে ফেলেন। সেই সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে (ভাষা আন্দোলনে জিন্নাহ বুঝে গিয়েছিল তার চালাকি বাঙালি মুসলিম ধরে ফেলেছে) এবং এর সঙ্গে বাদশা খান পাকিস্তানের আনুগত্য না মেনে নেয়ায় তৈরি করেন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মানে ওয়ান ইউনিট সলিউশন। সীমান্ত গান্ধী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, ফলে আবার তাকে জেলে পাঠায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী।

ইস্কান্দার মির্জাকে ব্যবহার করে ১৯৫৮-তে আইয়ুব খান এক অদ্ভুত যৌথ শাসক গোষ্ঠীর উৎপত্তি করেন। তারপরই অবশ্য মির্জার গলাধাক্কা জোটে। সেই সংবিধান আর সেই মুসলিম লীগেরও সমাপ্তি ঘটে। নতুন প্রভু আইয়ুব খান চেষ্টা করে এই মানুষটিকে কিনে নিতে। তাকে উৎকোচ দিতে চান মন্ত্রী করে। বাদশা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রূপে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আবার তাকে জেলে যেতে হয়, বন্দী থাকেন ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। ততদিনে তার শরীর ভেঙে গেছে, স্বাস্থ্যগত কারণে অবশেষে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয় সামরিক সরকার। এরপর আর দেশে থাকতে পারেননি, চিকিৎসা করতে যেতে হয় ব্রিটেনে আর তারপর চলে যান আফগানিস্তানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে। ফিরে আসেন ১৯৭২-এ, ততদিনে সামরিক শক্তি বাংলাদেশে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে ক্ষমতা ছেড়েছে আর অন্যদিকে তার ছেলে আব্দুল ওয়ালী খান ফিরেছেন সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। আবারও তিনি ভুট্টোর স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির রোষের শিকার হন ১৯৭৩ সালে, জেলে পাঠায় ভুট্টো সরকার। ঘৃণায় আর ক্ষোভে একবার বলেই ফেললেন, 'এই ইসলামিক সরকারের থেকে তো ব্রিটিশ শাসকরা ভাল ছিল, অন্তত তাদের ব্যবহার এইরকম জন্তুর মত ছিল না।' তাঁর শেষ আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের প্রস্তাবিত কালা বাঁধ প্রকল্পের উপর। এই বাঁধ সীমান্ত প্রদেশের অজস্র মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে এই ছিল তার অভিমত। প্রসঙ্গত আজও ওই বাঁধ করতে পারেনি পাকিস্তান সরকার।

আজীবন মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা এই মানুষটিকে আশির দশকে কংগ্রেস সরকার প্রস্তাব দেয় গান্ধীজির আশ্রমের কাছেই বাসস্থান করে দেওয়ার। সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজের এক সময়ের বাড়ি আফগানিস্তানের জালালাবাদে তাকে কবর দেওয়া হোক এটাই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা।

অবশেষে ১৯৮৮ সালে পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ সময়েও তিনি পেশোয়ারে গৃহবন্দী ছিলেন। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধিস্থ করা হয় আফগানিস্তানের জালালাবাদে। মৃত্যুর পর হাজারো জনতা সীমান্তের বাধা মানেনি। সেই অগ্নিগর্ভ সময় যখন সেভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার আর সৌদির পয়সায় মৌলবাদ জাঁকিয়ে বসেছে, ফৌজি রক্তচক্ষু ও ইসলামিক জঙ্গিদের হুমকি উপেক্ষা করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন অন্তিম যাত্রায়। শোভাযাত্রায় বোমা বিস্ফোরণ হয়, মারা যান পনেরোজন মানুষ, তবুও সম্মানীয় এই জানাজা আটকানো যায়নি। হায় জিন্নাহ! এ সম্মান যে তুমিও পাওনি, মারা গিয়েছ একা এম্বুলেন্সে। শুধু তাই নয় জনতার এই বেতাব বাদশা মারা যাওয়ার সময় যুদ্ধবিরতি হয় সেভিয়েত অধিকৃত আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে। ঠিক শুনেছেন, ওই মারাত্মক সময়ে একদিকে জালালাবাদ আর অন্য দিকে পেশোয়ারে একটা যুদ্ধবিরতি রেখা তৈরি করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ধর্মের নামে তৈরি সীমান্ত একদিনের জন্য হলেও একাকার হয়ে যায় মৃত বাদশাকে সম্মান জানাতে।

আজন্ম অহিংসার পূজারী মানুষটি হলেন খান আবদুল গফফর খান যিনি পাকিস্তানে বাচ্চা খান নামে পরিচিত। সাড়ে ছয়ফুট উচ্চতার এই পাঠান ক্ষমতা ও লোভের সামনে একদিনও মাথা নত না করেই দুনিয়া ছাড়লেন। ● সংকলিত

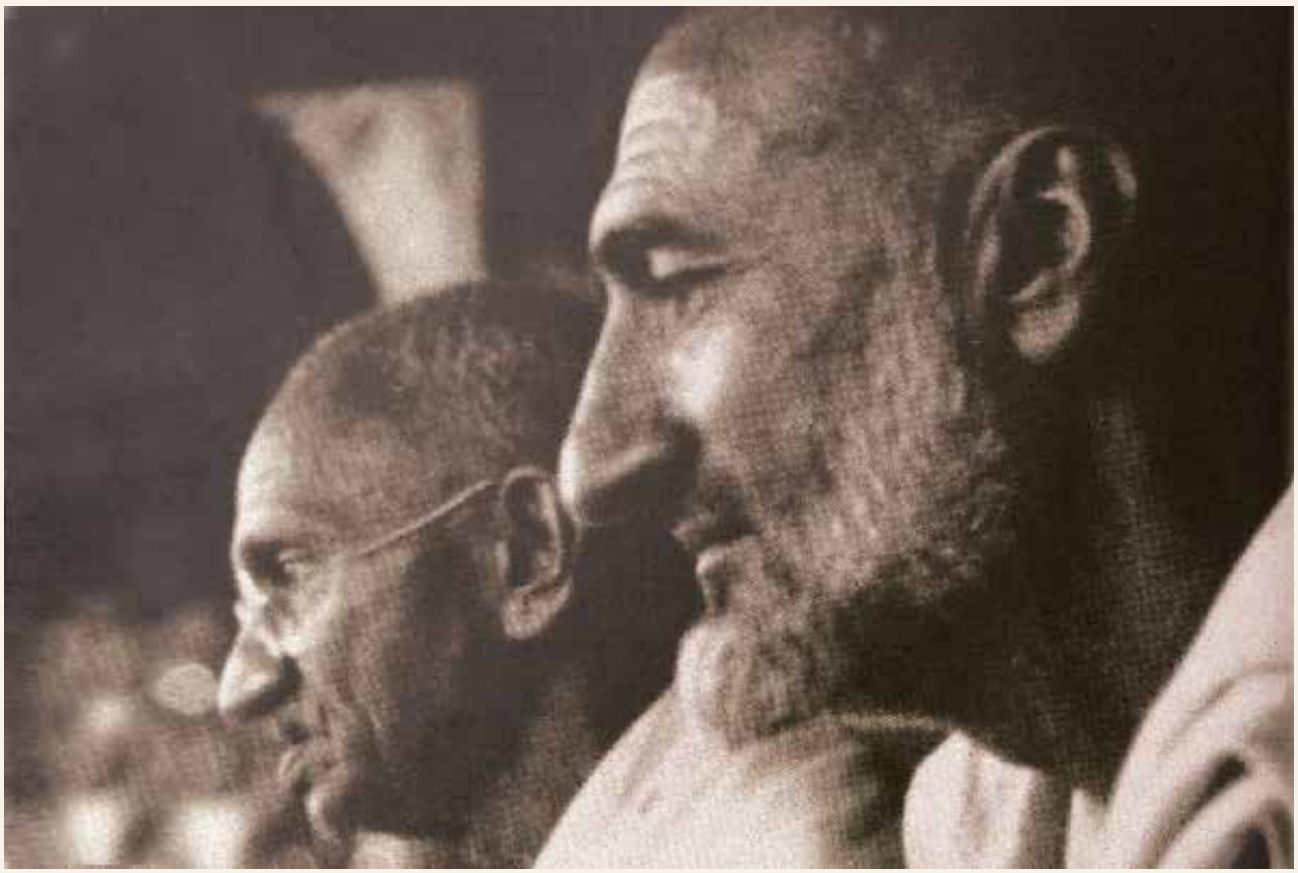

‘সীমান্ত গান্ধী’র ভারতের প্রতি ভালবাসা

মহাত্মা গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ খান আবদুল গফফর খান হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য সোচ্চার ছিলেন এবং ছিলেন অহিংসা নীতির প্রতি ঘোর বিশ্বাসী, তাঁর জন্ম বার্ষিকীতে ভারতের শ্রদ্ধার্ঘ...

কাগজে-কলমে পাকিস্তানী নাগরিক কিন্তু মনে-প্রাণে প্রকৃত হিন্দুস্থানী! খান আবদুল গফফর খানকে ১৯৮৭ সালে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান *ভারতরত্ন* পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ, গান্ধীবাদী এই নেতা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তিনি অবিভক্ত ভারতের জন্য সর্বদাই লড়াই চালিয়ে গেছেন। পাকিস্তান গঠনের ঘোর বিরোধী খান আবদুল গফফর খান বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন বলে মনে করতেন। কংগ্রেস যখন পাকিস্তানের দাবি মেনে নিয়েছিল, তিনি কংগ্রেসের নেতাদের বলেছিলেন, ‘আপনারা আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন।’

ভালবাসা এবং সম্মান তাঁর জন্য সর্বদাই আবর্তিত হয় যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘আমার সৌভাগ্য যে একজন বালক হিসেবে আমি খান আবদুল গফফর খানজীর চরণ স্পর্শ করেছিলাম। আমি এর জন্য গর্বিত। খান আবদুল গফফর খানই হোন কিংবা আসফাক-উল্লা খান, বেগম হজরত মহল, বীর শহীদ আবদুলমাল করিম অথবা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত এপিজে আবদুল কালাম, আমাদের চোখে আমরা সকলেই আসলে ভারতীয়।’

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর গফফর খান লালকুর্তি আন্দোলন পাখতুনদের মধ্যে শুরু করেন (খুদাই খিদমতগার), যার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংস আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পাখতুনদের রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। গান্ধীজীর আদর্শে ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর একান্ত অনুগামী হয়ে ওঠেন এবং খুদাই খিদমতগার কংগ্রেসকে সমর্থন জানায়।

ব্রিটিশ নাগরিক ও সমাজকর্মী মরিয়েল লেস্টার ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, ‘খান আবদুল গফফর খানকে চিনতে পেরে আমি মনে করি বিশ্বের চারপাশে অনেক সুন্দর মানুষ রয়েছেন। আমি আমার জীবনে এত ভাগ্যবান কখনও হইনি। তিনি ছিলেন ওল্ড টেস্টামেন্টের যুবরাজ, যার মধ্যে নিউ টেস্টামেন্টের হালকা ছোঁয়া রয়েছে। তিনি ছিলেন ভগবৎপরায়ণ। আপনাদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তাঁর সঙ্গে আপনারা আমার পরিচয় করিয়েছিলেন।’

আমির চন্দ্র বোম্বওয়াল গফফর খানকে সীমান্ত গান্ধী বলে ডাকতেন। তিনি পাখতুনিস্তানের দাবি জানিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বান্নু ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে পাখতুনিস্তানের যে দাবি তিনি করেছিলেন, ব্রিটিশরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

গফফর খান আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রতি তিনি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ওই দিন পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তিনি ১৯৪৮ সালের ৮ মে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় বিরোধী দল– পাকিস্তান আজাদ পার্টি গঠন করেন। এই দলটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। ১৯৮৪ সালে তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।

১৯৮৫ সালে তিনি কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অংশ নিতে শেষবার ভারতে আসেন। ১৯৮৮ সালে গৃহবন্দী অবস্থায় তিনি পেশোয়ারে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দেহ আফগানিস্তানের জালালাবাদে শায়িত রয়েছে। ভারতপ্রেমী কিংবদন্তী এই ব্যক্তিত্বকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

● সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

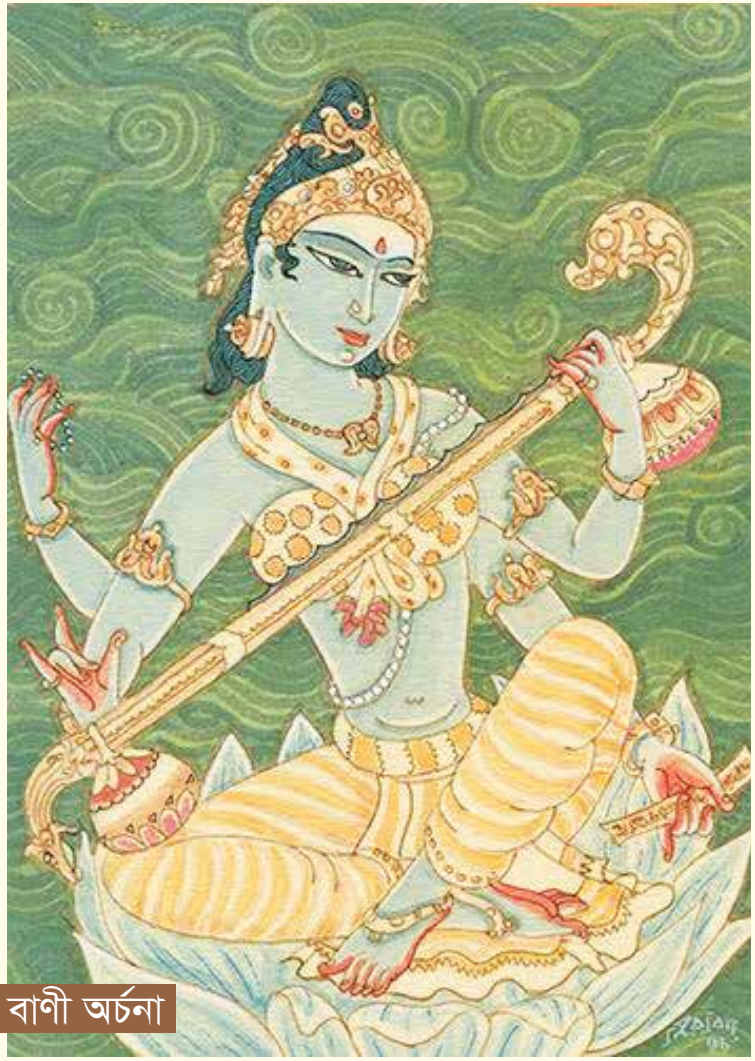

বাণী অর্চনা

বিদ্যা-মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতিমা

কুশলবরণ চক্রবর্তী

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'

বর্তমান বাংলাদেশে সাত্ত্বিক মাতৃপ্রতিমার প্রচারণা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। বিষয়টি ইদানীং বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় প্রায়ই আলোচিত হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, সাত্ত্বিক প্রতিমা বিষয়টি কি? এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কোনও সনাতন নেতাকে কিছু বলতে বললে প্রথমেই তিনি প্রতিমার শরীরের কাপড় সম্পর্কে বলে থাকেন। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারিনি যে, সকল নগ্নতাই অশ্লীলতা নয়। দেবী কালী নগ্ন, কিন্তু এতে বিন্দুপরিমাণ অশ্লীলতার ভাব নেই। আজ দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা প্রতিমাপূজা বিরোধী আব্রাহামিকদের মত হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিমার শ্লীল বা অশ্লীল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা অন্ততপক্ষে শাস্ত্রে প্রতিমার ধ্যানমন্ত্র বা বিভিন্ন স্তোত্রে যেমন করে প্রতিমার রূপ বর্ণিত হয়েছে সেই রূপকে অবলম্বন করে প্রতিমা তৈরি করতে পারি।

পদ্মপুরাণের সুবিখ্যাত 'সরস্বতীস্তোত্রম্'-এ দেবীর শ্বেতশুভ্র মাধুর্যমণ্ডিত রূপ বর্ণিত হয়েছে। দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধানুলেপন দ্বারা শোভিতা। তাঁর হাতে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলঙ্কারে বিভূষিতা।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥

দেবী সরস্বতীর গায়ের বর্ণ শ্বেত-শুভ্র। বিদ্যা যেহেতু সাত্ত্বিক এবং নিষ্কলুষ হতে হয়; তাই সেই সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে দেবী সরস্বতীও শুভ্রমূর্তিতে বিরাজিতা। বিদ্যা লাভের জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের আগে বাল্যকাল থেকে নিষ্কলুষ নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তবেই সে মুক্তিস্বরূপা বিদ্যা লাভ করবে। শ্রীচণ্ডীতে বিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥
(শ্রীচণ্ডী:০১.৫৭-৫৮)

'সেই মহামায়া দ্বিবিধা, বিদ্যা ও অবিদ্যা। যে মহামায়া মুক্তির জননী, তিনি বিদ্যা। আর যিনি সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপা, তিনি অবিদ্যা। যিনি মুক্তির জননী, তিনিই সনাতনী পরমা বিদ্যা। তিনিই সংসারবন্ধের কারণস্বরূপা এবং তিনিই মনুষ্য দেবতাসহ সকলের পরমেশ্বরী।'

দেবী সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। রাজ-হাঁসের মধ্যে এক অনন্য সক্ষমতা আছে, সে জল এবং দুধের মিশ্রণ থেকে দুধকে আলাদা করে নিতে পারে। জগতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই আছে, সেই পঙ্কিলতাপূর্ণ তামসিক অবিদ্যা থেকে আমাদের বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। দেবী সরস্বতীর হাতে বীণা। তিনি কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। বীণা সমৃদ্ধ শিল্পকলা চর্চার প্রেরণা দেয়। কলা বিদ্যার চর্চা মানুষকে বিভিন্ন নৃশংস অপকর্ম থেকে দূরে রেখে অতিশয় মানবিক করে তোলে। দেবী হাতে পুস্তক ধারণ করে আছেন। সরস্বতী পূজাতেও দেবীর শ্রীচরণে পাঠ্যপুস্তক সমর্পণ করে বিদ্যা যাচনা করা হয়। এ বেদাদি পুস্তক সকল জ্ঞানের আশ্রয়।

'মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা'; দেবী সরস্বতী বৈদিককাল থেকেই পূজিতা। অচিন্ত্য পরমেশ্বরের জ্ঞানময় মূর্তি হচ্ছে দেবী সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ ব্রহ্মার শক্তিস্বরূপা। তাই তাঁর নাম ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী এবং গায়ত্রী। বেদ-বেদান্তে দেবী সরস্বতীর সাকার নিরাকার উভয় রূপেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনও তিনি বাকশক্তিরূপা, কখনও সৃষ্টিশক্তিরূপা, কখনও সাবিত্রী মন্ত্ররূপা, কখনও নদীরূপা আবার কখনও ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরীরূপা। এ বিবিধরূপেই বেদ এবং বেদ পরবর্তী মহাভারতসহ একাধিক পুরাণে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে প্রেরণাদাত্রী, চেতনাদাত্রী এবং জ্ঞানমূর্তি রূপই প্রকাশিত

হয়েছে দেবী সরস্বতীর অসংখ্য বেদমন্ত্রে।
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥
(ঋগ্বেদ সংহিতা:১.৩.১১-১২)

'সত্য ও প্রিয়বাণীর প্রেরণাদাত্রী এবং সৎবুদ্ধির চেতনাদাত্রী মাতা সরস্বতী শুভকর্মকে ধারণ করে আছেন। জ্ঞানদাত্রী মাতা সরস্বতী প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা মহান জ্ঞান সমুদ্রকে প্রকাশ করেন এবং ধারণাবতী বুদ্ধি সমূহকে দীপ্তি দান করেন।'

দেবী সরস্বতী বৈদিক যুগ থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে পূজিতা হলেও, বৃহত্তর বাংলা, বিহার ও অসমে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি গুপ্তযুগ পরবর্তীকালের। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতী দেবীকে বিভিন্ন তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূজা করতেন। বিদ্যা-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে 'বাগেশ্বরী' নামটি প্রাচীনকালে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দেবীর আরাধনার পবিত্রতিথির নাম 'শ্রীপঞ্চমী'। দিনটি বিদ্যা-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনার এক শুদ্ধতম তিথি। শুক্লপক্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আসনে তালপাতার পুঁথি এবং দোয়াত-কলমকে দেবীর প্রতীক হিসেবে পূজা করার প্রথা আজও প্রচলিত। এ তিথিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে বাংলা-সংস্কৃত গ্রন্থ, দোয়াত-কলম, শ্লেট-চক সরস্বতী প্রতিমার চরণে সমর্পণ করে তাঁর কাছে বিদ্যার প্রার্থনা করত।

আধুনিক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরস্বতী পূজার প্রচলন শুরু হয় ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি সময়ে। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সকল প্রকারের আচারাদি মেনে সম্পন্ন করা হত। শুদ্ধ স্বরূপা দেবীর পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রী একান্ত আবশ্যকীয়। অভ্র-আবির, আমের মুকুল, দোয়াত এবং নল খাগড়ার কলম, যবের শিষ, পলাশ ফুল, বাসন্তী রঙের গাঁদাসহ বিভিন্ন প্রকারের ফুল। লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পূজার আগে কুল বরই খায় না। সরস্বতী দেবীকে কুল বরই নিবেদন করে, তবেই তারা সে-বছরের মত বরই ফল গ্রহণ করে। স্মৃতিশাস্ত্রে সরস্বতী পূজার দিনটিকে অনধ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ সেদিন বিদ্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ। প্রথা অনুসারে শ্রীপঞ্চমীতে দেবীর পায়ে বইপত্র সমর্পিত করে দেবীর কাছে বিদ্যা যাচনা করতে হয়। যথাবিহিত দেবীর পূজা করে, পরবর্তীসময়ে লেখনী-মস্যাধার, পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করতে হয়। দেবী সরস্বতীর পূজা মন্ত্র হল– 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' দেবীর বীজমন্ত্র হল 'ঐং'। পূজাশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা মিলে দেবীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। পুষ্পাঞ্জলিতে কল্যাণময়ী ভদ্রকালীরূপা সরস্বতীর কাছে বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গসহ সকল বিদ্যা প্রদানের প্রার্থনা করা হয়।

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা–

অনেক বনেদি পরিবারে সরস্বতী পূজার পরদিন সকালে পুনরায় দেবীর পূজা করা হয়। পূজা সমাপন করে চিড়া ও দই মেশানো দধিকরম্ব বা দধিকর্মা দেবীকে নিবেদন করে সন্ধ্যায় দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বসন্ত পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজার আগের দিনটিকে 'বরদা চতুর্থী', 'বিনায়ক চতুর্থী', 'গণেশ চতুর্থী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এ চতুর্থী তিথিতে বৃহত্তর বঙ্গের বহুস্থানে ঋদ্ধি-সিদ্ধি এবং সৌভাগ্য কামনায় গণেশপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সরস্বতী পূজার পরের দিনে 'শীতলষষ্ঠী' ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন অরন্ধন পালন এবং গোটা-সেদ্ধ খাওয়ার প্রথা বঙ্গের বহুস্থানেই প্রচলিত। দেবী সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচণ্ডীর উত্তর চরত্রের শুরুতে দেবী সরস্বতীর একটি ধ্যানমন্ত্র দেখা যায়। সেই ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে অষ্টভুজা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবী সরস্বতী শ্বেতহংসবাহনা, তবে কোনও কোনও অঞ্চলের প্রতিমায় তাঁকে ময়ূরবাহনা রূপেও দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা সরস্বতী পূজিত হন। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গে প্রাচীনকালে চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হলেও, বর্তমানে বঙ্গদেশে দেবী দ্বিভুজা হংসবাহনা রূপে ঘরে ঘরে পূজিতা। পদ্মপুরাণের সুবিখ্যাত 'সরস্বতীস্তোত্রম্'-এ দেবীর শ্বেতশুভ্র মাধুর্যমণ্ডিত রূপ বর্ণিত হয়েছে। দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধানুলেপন দ্বারা শোভিতা। তাঁর হাতে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলঙ্কারে বিভূষিতা।
শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥

দেবী সরস্বতীকে নিয়ে ভারববর্ষের অধিকাংশ কবিই কাব্য রচনা করেছেন; দেবীর কাছে কলা-বিদ্যার প্রার্থনা করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রণেতা আচার্য দণ্ডী তাঁর *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থের শুরুতেই দেবী সরস্বতীর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিয়ে একটি অপূর্ব মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করেছেন। সেই শ্লোকে তিনি দেবী সরস্বতীকে অনন্তকাল তাঁর মানসলোকে ক্রিয়াশীল থাকতে আহ্বান করেছেন।
চতুর্মুখ-মুখাম্ভোজ-বনহংসবধূর্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥
'চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখপদ্মরূপ, বনহংসবাহনা হে মা সর্বশুক্লা সরস্বতী; তুমি অনন্তকাল আমার মানসলোকে আনন্দের সঙ্গে বিরাজ কর।'

শুধুই সংস্কৃত নয় বাংলার প্রাচীন-নবীন প্রায় সব কবির রচনাতেই দেবী সরস্বতীর বন্দনা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে মধ্যযুগের সর্বশেষ খ্যাতিমান কবি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর বিখ্যাত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ত্রিপদী ছন্দে দেবী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন।
'শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেতবীণা শ্বেতহাস
শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি।
বেদবিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্যগীত বাদ্যের ঈশ্বরী।'

বাংলা ভাষায় সরস্বতীর বন্দনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাও অতুলনীয় । যদিও পারিবারিক বিশ্বাসে তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তারপরও তিনি তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন স্থানেই দেবী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। এর মধ্যে তাঁর *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতাটি সুবিখ্যাত। অনন্যসাধারণ কবিতাটিতে কবি প্রচণ্ড আবেগঘনভাবে দেবী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। কবিতার কবিচরিত্রটি যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তা স্পষ্টভাবে টের পাওয়া যায়।
'প্রকাশো জননী নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরস-বাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরণ-সুন্দর-হাসি
বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
তব সংগীতস্রোতে।

দেবী সরস্বতী বিদ্যা-কলার চর্চাকারী শিল্পীদের কাছে ইষ্টস্বরূপা, পরমারাধ্যা। দেবীর প্রসন্নতাতেই তাঁদের শিল্পীসত্তা প্রকাশিত হয়, বিকশিত হয়। তাই শুধুই ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবী জুড়ে দেবী সরস্বতী পূজিতা। ভারববর্ষে তো বটেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ পৃথিবীর বহু দেশেই দেবী সরস্বতীর উপাসনা করা হয় অনাদিকাল থেকে। ঋতুচক্রে শীতের তীব্রতা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি থেকে কমতে শুরু করে শ্রীপঞ্চমী তিথি অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিনে এসে প্রায় সম্পূর্ণ কমে যায়। শীতের তীব্রতা কমে গিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দেহেই শ্রী বা সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটে। তাই শ্রীচিহ্ন হিসেবে শ্রীপঞ্চমী তিথির সকালবেলায় সবাই গায়ে হলুদ মেখে স্নান করে। স্নান শেষ করে পবিত্র হয়ে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করে দেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করে।

কুশলবরণ চক্রবর্তী
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

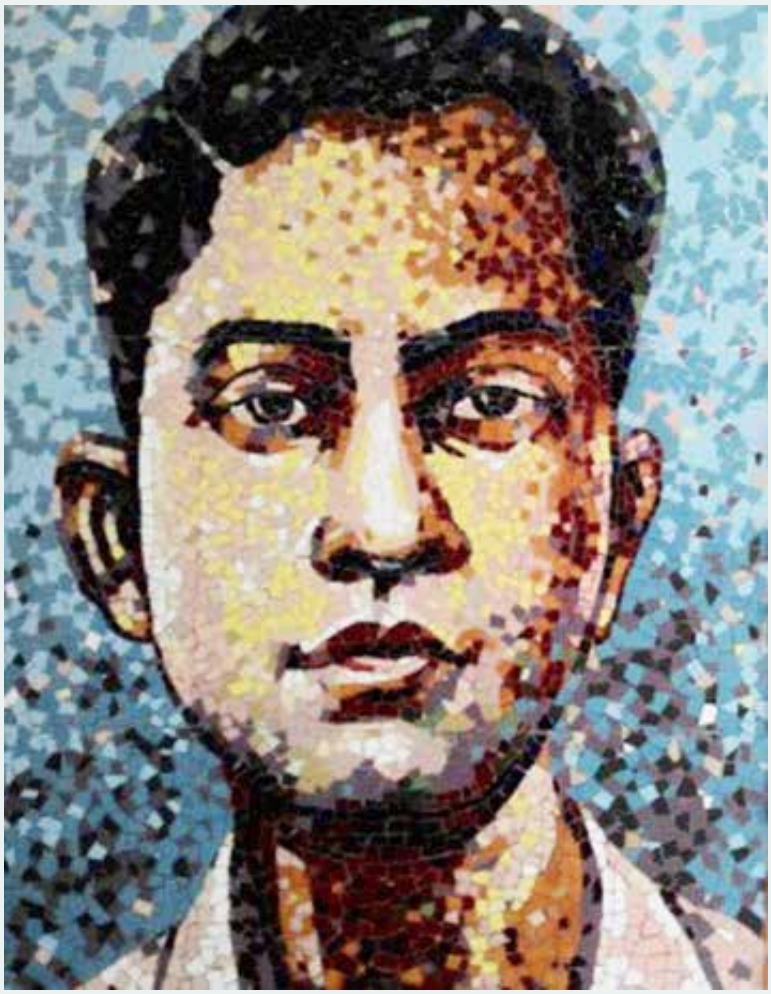

স্মরণ

ভাষা-শহিদ আবুল বরকত মুর্শিদাবাদের সন্তান

ঈমাম হোসাইন

সারা ভারতবর্ষ যখন স্যার জন অলসব্রুক সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় জাগ্রত হল, সে-সময় ১৯২৭ সালের ১৬ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সালারের পাশে বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আবুল বরকত। পাল-সেনযুগের দুটি সমৃদ্ধ গ্রাম– সাল্য গ্রাম এবং কঙ্কগ্রাম। তাদের পাশে আর একটি চিরসবুজ গ্রাম বাবলা, যার পাশে কুলকুল করে বয়ে চলেছে বাবলা নদী। বাবলায় বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, অধিকাংশ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। বরকতের পিতার নাম সামসুজ্জোহা এবং মা হাসিনা বেগম।

পারিবারিক দিক থেকে সামসুজ্জোহার পরিবার ছিল লম্বা চওড়া, চেহারায় সুশ্রী, উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী। আবুল বরকতও ছিলেন অস্বাভাবিক লম্বা। বাবা শামসুজ্জোহা এত লম্বা যে বহু দরজায় ঢোকার সময় তাঁর মাথা চৌকাঠে আটকে যেত বলে তিনি মাথা নিচু করে দরজা পার হতেন। সেই পরিবারের ছেলে আবুল বরকত। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় বরকতের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। *শহীদ-স্মারক* শীর্ষক কবিতায় অন্যান্য শহীদের সঙ্গে বরকত সম্পর্কেও হৃদয়স্পর্শী উল্লেখ রয়েছে:

‘আম্মা, তার নামটি ধরে একবারও
ডাকবে না তবে আর?
ঘূর্ণিঝড়ের মত সেই নাম
উন্মুখিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটো ঠোঁটের ভেতর থেকে
মুক্তোর মত গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না,
সারাটি জীবনেও না?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি,
কতো দিন?
আবুল বরকত নেই
সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল-শরীর বালক,
মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটত
যে তাকে ডেকো না;’...

ছেলেবেলায় তার ডাক নাম ছিল আবাই। শিশু বয়স থেকেই মেধাবী আবুল বরকতের পড়াশোনা শুরু হয় বাবলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ১৯৩৭-৩৮ সালে তালিবপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৫ সালে তালিবপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলের পাঠ শেষ করলে তাঁকে ১৯৪৫ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি করা হয় এবং সেখান থেকেই তিনি ১৯৪৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন।

১৯৪৭ সালে কলমের খোঁচায় সৃষ্ট রেডক্লিফ লাইনে কাঁটাতার লাগিয়ে ভাগ করা হল ভারতবর্ষকে। সীমানা দিয়ে বলা হল– এই দেশটা আমার, ওই দেশটা তোমার। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের সন্ধ্যার পর রেডিওতে ঘোষণা হল মুর্শিদাবাদকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আবার মধ্যরাতে বলা হল মুর্শিদাবাদ ভারতের সঙ্গেই থাকবে। এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল কিশোর আবুল বরকতও। ভারত বিভাগের পর মা হাসিনা বেগম নিরাপত্তা আর পড়াশোনার কথা চিন্তা করে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় বসবাসরত ভাই আবদুল মালেকের বাসায় পাঠান বরকতকে। আবুল বরকত ছিলেন নম্র, ভদ্র ও মেধাবী। ঢাকায় এসে পড়াশোনা শুরু করলেন বরকত। ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তারপর এমএ ক্লাসে ভর্তি হলেন উচ্চশিক্ষার আশায়।

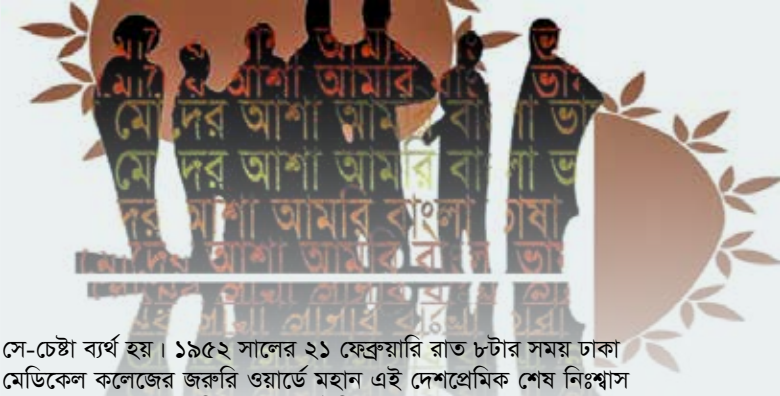

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, সংগীত, শিল্প, অভ্যাস, ঐতিহ্য সংস্কার এই সব। এই সংস্কৃতি দিয়েই তো একটা জাতির, তার মানুষের পরিচয়। তাছাড়া সংস্কৃতি না থাকলে অর্থ-বিত্তও হয় না। যার শিক্ষা নেই, তাকে শোষণ করা সহজ। সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন ভাষা, মাতৃভাষা। সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতা ও দেশভাগের আগে থেকেই ভাষার বিষয়টি স্বাধীনতা আন্দোলনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল। দেশ স্বাধীন হলে প্রশ্ন উঠে কোন্ ভাষা হবে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা? কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার করার আওয়াজ তোলা হয়, অন্যদিকে মুসলিম লিগের দৃষ্টি উর্দু ভাষার প্রতি, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের এই মতের সঙ্গে গান্ধীজি বা জিন্নাহ সাহেব একমত ছিলেন না, তাঁদের দুজনেরই মতামত ছিল প্রতিটি প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার প্রতি, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর আর এই মত টিকল না। ভারতে যেমন হিন্দিকে নিয়ে রাষ্ট্রভাষা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হল আর তাতে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে অসন্তোষের জন্ম হল, তেমনই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্থানের মানুষের ওপর বাংলা ভাষার বদলে উর্দু ভাষার ভার চাপিয়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ফলে ছাত্র-জনতা তাঁদের মাতৃভাষার দাবি নিয়ে পথে নামতে বাধ্য হল, কারণ উর্দুকে জাতীয় ভাষা করলে বাংলাকে অবহেলিত করে রাখা হবে, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের চাকরি ও জীবনমান এগিয়ে যাবে আর পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া হলে ঢাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের নুরুল আমিন সরকার তা প্রতিহত করতে ঢাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করেন। ছাত্ররা পরদিন ১৪৪ ধারা ভেঙে রাস্তায় নেমে পড়ল। পুলিশ চেষ্টা করছিল ছাত্রদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু ছাত্রদের শক্ত প্রতিরোধের কারণে তারা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল।

কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ শুরু হলে অনেকের মত আবুল বরকতও মধুর ক্যান্টিনের পার্শ্ববর্তী দেয়াল টপকে মেডিকেল ক্যাম্পাসে ঢোকেন। সেখানে শুরু হয় ইট-যুদ্ধ। ছাপরার তৈরি ব্যারাকের মত ঘরে মেডিকেল ছাত্রদের হোস্টেল। আবুল বরকত সেখানে গিয়ে অবস্থান নেন। অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁরা ইট নিয়ে পুলিশের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যান। আবার পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করে পুরো এলাকাটাকে ধোঁয়ায় ছেয়ে ফেললে তিনি পিছিয়ে ব্যারাকের দিকে আসেন। চোখের জ্বলুনি থেকে বাঁচার কৌশল ছাত্ররা আগেই তৈরি করেছিল। বালতি, ডেকচি, হাঁড়ি-কলসি যা পাওয়া গেছে তাতে পানি ভরে রাখা হয়েছিল। ছেলেরা বারবার করে চোখ ধুয়ে নিচ্ছিল। কেউ বা গায়ের কাপড় খুলে পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে চোখ মুছছিল। এখানে মেডিকেলের ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, কলা বিভাগের ছাত্র, বিজ্ঞানের ছাত্র-সবাই এসে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হল। এটাই তখন প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। বাবুর্চিরা ইটের পালা থেকে ইট তুলে এনে ভেঙে ভেঙে ঢিল বানিয়ে স্তূপ করে রেখেছে। সেখান থেকে ঢিল তুলে নিয়ে ছেলেরা ছুড়ে মারছে পুলিশের দিকে। সাহসী ছেলেরা টিয়ারগ্যাসের শেল এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে পাল্টা ছুড়ে মারছে পুলিশের দিকেই। তখন পুলিশও কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

বেলা ৩টার দিকে পুলিশ হোস্টেল চত্বরে ঢুকে কোনওপ্রকার সতর্কতা না জানিয়ে নির্মমভাবে গুলি চালাতে থাকে। সেই সময় আবুল বরকত অন্য এক বন্ধুর দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগে হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, ততক্ষণ রক্তধারা ছুটে মাটি ভিজে যাচ্ছিল। তলপেটে গুলি লেগেছিল তার। পরনের নীল হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট ও কাবুলি স্যান্ডেল রক্তে ভিজে যাচ্ছিল। দুই তিনজন ছাত্র ছুটে এসে সুঠামদেহী বরকতকে কাঁধে তুলে মেডিকেলের জরুরি বিভাগের দিকে দৌড়াতে থাকেন। বরকত তখন বলেছিলেন 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, হয়তো আর আমি বাঁচব না, পুরানা পল্টনে বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে এই খবর পৌঁছে দিবেন।' ডাক্তারেরা তাকে বাঁচানো জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি ওয়ার্ডে মহান এই দেশপ্রেমিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম এল ঢাকা থেকে। আবুল বরকতের আব্বা শামসুজ্জোহা সেই বার্তা পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হাসিনা বেগম বুঝতে পারছেন না কী হয়েছে? ছেলের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে ওপার বাংলায়। কলকাতায় কিংবা মুর্শিদাবাদে কখন কী বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে। তাহলে কী ঘটল আবুল বরকতের! পাকিস্তান কি মুসলমানদের জন্য নিরাপদ নয়? উত্তর খুঁজতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আকাশে তারার দলের দিকে।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মোট কতজন শহিদ হন তার সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায়নি। কারণ ধারণা করা হয়, অনেক শহিদের লাশ মর্গ হতে মিলিটারি ও পুলিশ গুম করে ফেলেছে। পরের দিন তাদের জানাজা হবে– ছাত্ররা মাইকে এই ঘোষণা দিলে পুলিশ সেই রাতেই মর্গ থেকে লাশ সরিয়ে ফেলে। আবুল বরকতের মামা আব্দুল মালেক ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী হিসাব কর্মকর্তা এবং তার এক আত্মীয় আবুল কাসেম এসএমজি বিভাগের উপ-সচিব। তারা দু'জনে তদবির করে পুলিশের কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে আবুল বরকতের লাশ উদ্ধার করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে পুলিশের কড়া পাহাড়ায় আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে আবুল বরকতের লাশ দাফন করা হয়। ২৫ মার্চ, ১৯৫২ সালে শহিদ আবুল বরকতের ছোট ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন আহমদের এজলাসে একটি মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহকুমা হাকিম কিছু অজুহাত তুলে সে-মামলা গ্রহণ করেননি।

১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস পালিত হত গভীর আবেগে। তার মধ্যে ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিন পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১২ নং শেডের কাছে একটি শহিদ মিনার স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রথিত করেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মওলানা ভাসানী ও শহিদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এলে বাবলা গ্রামের মানুষেরা এখনও প্রভাতফেরিতে যান এবং শহীদ বরকত স্মরণে নির্মিত বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যতদূর জানা যায়, ভাষা শহীদ আবুল বরকত কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তিনি একেবারে রাজনীতি অসচেতন ছিলেন না। ভাষা আন্দোলন ও গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর একটি গণমুখী চেতনা ছিল। তাঁকে এসব গণমুখী আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা গেছে। শহিদ বরকতের মা হাসিনা বেগম তাঁর পুত্রের কবরে পুষ্পার্ঘ্য দিতে জীবিতকালে কয়েকবার ঢাকায় আসেন। ১৯৬৯ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকায় না আসতে পেরে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ছাত্রদের কাছে একটি লিখিত শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। তাতে তিনি লিখেন, 'আজ থেকে ১৭ বছর আগে এই অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি আমার প্রিয় সন্তান আবুল বরকতকে হারিয়েছি। বরকতকে হারিয়ে আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি, তেমনি আনন্দও পেয়েছি। আনন্দ পেয়েছি এই জন্য যে, আমার বরকত প্রাণ উৎসর্গ করেছে নিজের মাতৃভাষার জন্য। এবং আমি এক বরকতকে হারিয়ে পেয়েছি পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ছাত্র যারা আমার কাছে বরকতের মতোই সমান প্রিয়।'

পৃথিবীতে যতদিন বাঙালি থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকবেন ভাষা-শহীদ আবুল বরকত। বাংলাদেশ সরকার এ অমর শহিদকে মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) প্রদান করে। ভাষার মাসে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি ভাষা-শহিদ আবুল বরকতকে। **ঈমাম হোসাইন** প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার

পঙ্‌ক্তিমালা

আনন্দমোহন রক্ষিত

এক.
তোমাকে বেসেছি ভাল
তুমিও বাসিও,
নাদানের দিকে ফিরে
একবার চাহিও।

দুই.
গাঢ় আঁধারে আমি
তোমাকে দেখতে পাই,
মনের আলোতে কেন
খুঁজে নাহি পাই।

তিন.
তোমার অঙ্গ জুড়ে
হিরন্ময় আলোক দ্যুতি,
জ্যোৎস্না বিলাসী রাতে
অপার নক্ষত্র জ্যোতি।

চার.
রাত জাগা ডাহুকের ডাক
শুনিতেছি নির্ঘুম রাতে,
পাশে তুমি শুয়ে আছ
নির্মোহ নিরালাতে।

পাঁচ.
দুঃখের মাঝেও তুমি
মহা হিল্লোল,
অন্তরে জাগাও শুধু
আনন্দ কল্লোল।

ছয়.
(তুমি) ভীষণ ভাবাতে পারো
তুলে জাগরণ,
করুণ কাঁদাতে পারো
কারণে অকারণ।

সাত.
মুঠোফোনে জানতে চাই
তোমার মনের ভাব,
কাছে দূরে থাক তুমি
পাই না হৃদয়ের তাপ।

বাহান্নর কবিতাকে আমার মা মনে হয়

শেখ নজরুল

বাহান্নর কবিতাকে আমার মা মনে হয়
মনে হয়– আমার ছোট বোন– প্রিয় স্বজন
বাহান্নর কবিতা আমার প্রিয় নদী
আমার পোষা টিয়েপাখি
খোকা ওঠ, খোকা ওঠ সুরে প্রত্যহ ভোরে
যে করে মধুর বাংলায় ডাকাডাকি।

বাহান্নর কবিতা– পৌষের সকাল
চিতই পিঠার গন্ধে ঘুম-জাগা কলরব
কুয়াশা-কুয়াশা ভোরে বাহান্নর কবিতা
খড়কুটো কুড়িয়ে জ্বালানো আগুন
হঠাৎ আলোয় রোদ পোহানোর উৎসব।

বাহান্নর কবিতা আমার সবচেয়ে বড়প্রেম
প্রথম লেখা ভালবাসার চিঠি
কাঁপা-কাঁপা হাতে প্রথম শব্দ– প্রিয় অদিতি
বৃষ্টিতে ভেজা, রোদ্দুরে পোড়া, ফালগুনে জাগা
বাহান্নর কবিতা আমার ষড়ঋতু
বৃষ্টির জলে উপচানো ধানখেত
ভরপুর দিঘিতে প্রথম সাঁতার
বাহান্নর কবিতা প্রেয়সীর লালঠোঁট
শিমুল পলাশের আগমনী সংকেত

বাহান্নর কবিতা লাঙলের ফলার মত চকচকে
মনে হয়, অগ্রহায়ণে নতুন ফসলের গান
শস্যের ভাষা, ফুলে-ফলে জাগ্রত আঘ্রাণ

বাহান্নর কবিতা–সাহসী, উদ্ধত
সহজ-সরল– একরৈখিক
বাহান্নর কবিতা বৃক্ষের শাখায়
সবুজ পাতায় ছড়িয়ে থাকা চারদিক।

আমি মানুষ

মিতুল সাইফ

আমি মানুষ। পুরো পৃথিবী আমার মানচিত্র। সীমান্ত, সীমানা আমাকে ছোট করে দেয়। আমাকে বেঁধে রাখে। আমার পাখা টেনে ধরে সীমানারক্ষী। কোনও দেশেই আমি মুক্ত নই। আমি মানুষ। গোটা সৌরভুবন আমার দুরন্ত অবারিত মাঠ। আমি পাখি হতে পারি না। আমাকে আটকে দেয়, পথ ঢেকে রাখে তারকাঁটা। এটা কোন্ যুগ? সভ্যতার দু'পায়ে শেকল। মানবতার হাতে হাতকড়া। অথচ মানুষ মুক্ত হতে পারত!

গোলাম কিবরিয়া পিনুর তিনটি কবিতা

দ্বিমাত্রিক পর্ব

দ্বিমাত্রিক পর্বে–
বুনো হয়ে যাই
হ্রদ ও জলাভূমিতে নামি
হিম ও তুষারে!
আল্‌প্‌স ও পিরেনিজ এলাকায় ঘুরি–
বরফমোড়া সাগর চুপসে যায়
–উত্তাপে উত্তাপে!
ভূতলস্থ ভবনও কেঁপে কেঁপে ওঠে–
ধাতব পাতও গলে যায়!
স্নায়ুর উত্তাপে দ্বিভুজে বিদ্যুৎ আসে–
অতিমাত্রায় সংবেদনশীল অনুভূতি নিয়ে
শীতকাল গ্রীষ্মকাল হয়ে যায়
–হিমপ্রপাতের সময়েও!

উদয়মণ্ডল

অস্থি ও মাংসপেশীর সংবাহন নেই?
আন্দোলিত হও
বিদ্যুৎপ্রবাহে!

গৌরবর্ণ মানুষও গোঁড়া হতে পারে
কৃষ্ণবর্ণ মানুষও।
পুষ্পবৃক্ষের শুষ্ক মূল থেকে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের
অভিলাষ নেই?
সঙ্গীতে বনের পশুরাও আত্মহারা হয়ে যায়!

গোঁড়ামির গোড়া খসে ফেলো–
তুমি শুধু হাড়-হাড্ডি নও!
গুপ্ত থেকে থেকে সুপ্ত রাখো–
নিজের প্রবল অভিব্যক্তি!

সূক্ষ্ম মসলিনের সূত্রাবলী জেনে নিয়ে
তোমারই হাতে সুচিশিল্প–
মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।
সৃজনপ্রকৃতি তোমারও প্রকৃতিতে আছে
এখনো তোমার উদয়মণ্ডলে তুমি তো জীবন্ত!

লাবণ্যময়তার রস

ডুবজলে গিয়ে ডুগডুগি বাজানো যায় না!
ও ডুমকি– তুমি জান?

ডুবুডুবু জলে ডুব-সাঁতার দিয়ে
তোমাকে ছোঁয়ার পর–
ডুমুর ফুল হয়ে যাই!

তোমার চৌকাঠের গায়ে–
কপাট বসানোর উপযোগী লোহার হুক খুলে ফেলি
অবগাহনের সময়ে।

ঢেউয়ের মাঝে ঢেউ খেলানোর নেশা
লাবণ্যময়তার রসে–
কীর্তিনাশা হয়ে যায়।

সুখ বিহগী

প্রণব মজুমদার

সুখ সে তো ক্ষণকালের চপলা বিহগী
হরিণীর মত চলা
ধাবমান চড়াই পাখি
খাঁচায় সে থাকে না
এ প্রাণ থেকে অন্য জীবনে ছুটে চলা
সুখ পাখি বড়ই চঞ্চলা

একদিন পরিযায়ী সুখ পাখি আমায় বলেছিল
তোমার আরাধনায় প্রতীক্ষার শেষে
আমার আনন্দ আগমন
বড্ড তাড়া আমার!
ক্ষণিকের জন্য আসা
জানো না! জীবনকে শান্তি দিতে আমি শিখিনি
সে আমার ধাঁচে নেই
বন্ধু নই আমি কারো
কারো মিত্র আমি হতে পারি না
আমি তো সুখ নামের এক অস্থির বিহঙ্গী।

অন্তরালবর্তী

আঁখি বিশ্বাস

আপন সুরের অনুরণন অপর কণ্ঠে
নিরব নিস্তব্ধতায় শুষে নিই আনন্দ -বেদনা।
বাক্যের যেখানে সমাপ্তি, নিরবতাই সেখানে সম্বল।
উদার কণ্ঠে অপয়ার গুণকীর্তন।
আপনার গহীনে মূকের অট্টহাসি।
আনন্দের আতিশয্য হুল ফোটায় পূর্ণচ্ছেদের।
তোলপাড় তোলে সমগ্র যাপিত জীবনে।
চেনাপথে ফিরে আসা গতানুগতিকতার জের ধরে।
প্রতিনিয়ত ভাল থাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা...

প্রতিযোগিতা

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে

রানা মজুমদার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা অর্জন করেছিলাম বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শব্দটি ছোট হলেও এর ব্যাপ্তি বিশাল। সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতা শব্দটির মানে। একজন তরুণ হিসেবে আজকের এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি স্বাধীনতার বিভিন্ন মানে খুঁজে পাই।

শুরু করছি পরিবার থেকে। আমি যখন বাসা থেকে বের হই তখন আমার মা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসিস। পক্ষান্তরে আমার বোন যখন বাসা থেকে বের হয় তখন বলেন, সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে আসিস মা। অর্থাৎ ছেলে হওয়ার কারণে আমি চলাফেরার স্বাধীনতা পেয়েছি, যেটা আমার বোন পায়নি। আমার জন্য অমাবস্যা, পূর্ণিমা যতটা নিরাপদ আমার বোনের জন্য ঠিক ততটাই অনিরাপদ। আর এই চিত্রটি শুধুমাত্র আমার পরিবারের নয়। আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পরিবারের মেয়েকে নিয়েই তার মা-বাবা এমন শঙ্কায় থাকেন। এই প্রবন্ধটি যখন লিখছি তখনও খবরে দেখতে পেলাম রাজধানীর কলাবাগান এলাকায় সহপাঠীর হাতে ধর্ষিত হয়েছে ও লেভেলে পড়ুয়া একটি মেয়ে। এখানেই শেষ নয়।

ধর্ষণের পর মেয়েটিকে নিজের হাতে হত্যা করেছে নরপিশাচটি। হয়তো এই প্রবন্ধটি শেষ করার আগেই স্বাধীন বাংলার অন্য কোথাও কারো বোন, কারো মেয়ে ধর্ষিত হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমার স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা। যেখানে একাত্তর সালে আমরা জীবন দিয়ে পাকিস্তানীদের হাত থেকে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলাম, সেখানে আজকে আমাদের নিজেদের হাতেই লাঞ্ছিত হচ্ছেন আমাদের মা-বোনেরা!

অর্থাৎ আজকের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরেও নারীরা আজও পরাধীনতার শেকলে বাঁধা, ধর্ষকদের ভয়াল থাবা থেকে তারা আজও নিরাপদ নয়। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের উচিত ছিল নারীদের জন্য নিরাপদভাবে চলাফেরার পরিবেশ নিশ্চিত করা, তাদের এগিয়ে চলাকে বাধাহীন করা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে অহরহ। অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হল ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার অধিকার।

আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত। অথচ আজকে রাস্তায় বের হলে দেখতে পাই দামী পোশাক-আশাক পরিহিত এক শ্রেণীর মানুষ যখন যেভাবে মন চায় খাবার অপচয় করছে, আর তাদের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট দৌড়ে এসে নিয়ে যাচ্ছে পথশিশুরা। এই ছিন্নমূল শিশুদের যে বয়সে কাঁধে স্কুলের ব্যাগ থাকার কথা ছিল সেই বয়সে তাকে কাঁধে নিতে হচ্ছে সংসারের সমূহ ভার। আমরা তাকে শৈশবের স্বাধীনতা দিতে পারিনি। বরঞ্চ দিয়েছি আতংকে ভরা বঞ্চনার জীবন। তাই এখানে স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি প্রতিটি শিশুর হাসি আনন্দে বেড়ে উঠা, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। শিক্ষার কথা যখন চলে এসে গেল, তখন অবধারিতভাবেই শিক্ষিত বেকারের প্রসঙ্গটিও চলে আসে। আমাদের শিক্ষার হার দিন দিন বাড়ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। শুধুমাত্র টাকার জোর, মামা-চাচার জোর না থাকার কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী চাকরি পাচ্ছে না। স্বপ্নভঙ্গের দায়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট বেছে নিচ্ছে মাদক, সন্ত্রাসের পথ। অথচ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে সুমহান মর্যাদায় তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল তাদের হাতেই। তাদেরকে সেই সুযোগটি তৈরি করে দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশকে বিনির্মাণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন কৃষক, শ্রমিকরা। সেই কৃষকরা পাচ্ছেন না উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম, শ্রমিকরা পাচ্ছেন না শ্রমের সঠিক মূল্য। বেশ কয়েকদিন আগে এমনই একটি ঘটনা নাড়া দিয়েছে পুরো দেশবাসীকে। *প্রথম আলো*য় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় দুধের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে পাবনার বিপুলসংখ্যক খামারি দুধ রাস্তায় ঢেলে প্রতিবাদ জানান। আর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে, সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে কৃষকদের সর্বশেষ পরিণতি আত্মহত্যা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কৃষক-শ্রমিকের রক্তে ভেজা আমাদের এই মহান স্বাধীনতা। মুক্তিকামীদের নামে শপথ নিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে তারাই গড়ে তুলছেন এই বাংলাদেশকে। তাই আমি স্বাধীনতা বলতে বুঝি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া, ঋণের দায়ে আর একজন কৃষকেরও আত্মহত্যার সংবাদ না শোনা।

আমি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। ভাবতেই নিজের মধ্যে এক ধরনের স্বর্গীয় ভাললাগা অনুভূত হয়। অথচ সেই ভাললাগার রেশ কাটতে না কাটতেই চারপাশে চোখ মেলে দেখতে পাই কতভাবেই না আমার স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। তারপরও আশায় বুক বাঁধি। বিশ্বাস করি, একদিন আইনের চোখে সবাই সমান হবে, চাকরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে, নারী-পুরুষে থাকবে না কোনও বৈষম্য, অনাহারে থাকবে না এই বাংলার একটি মানুষও, আর কোনও ধর্ষণ হবে না এই বাংলার মাটিতে, উৎসবে-আনন্দ, পূজা-পার্বণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকবে বাংলার প্রতিটি ঘরে-ঘরে। সেইদিন লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা শব্দটি পাবে এর সঠিক মানে। আর স্বাধীনতা শব্দটি হবে শুধুই আমাদের।

রানা মজুমদার
তরুণ শিক্ষার্থী, 'আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কি' প্রতিযোগিতা বিজয়ী

ছোটগল্প

মধুপ-কাহিনি

রহিমা আক্তার কল্পনা

বিষয়টা হঠাৎ করেই, বহু বছরের ব্যবধানে আমাকে চমকে দেয়। কিংবা তার চেয়েও বেশি। বলা যায়, আমাকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। আমার বন্ধু শামীম, শামীম খন্দকার– মাঝখানে ন'বছরের অদর্শন সত্ত্বেও, তার চেহারা সুরতে নয়টি বছরের পরিষ্কার পরিবর্তনের ছাপ বহন করা সত্ত্বেও, কথাটি এমন সহজে বলে, যেন এটি গতকাল বা পরশুর ঘটনা। যেন রোজ আমাদের দেখা হয়। যেন ঘটনাটি ঘটবার পর পুরো উনিশটি বছর কেটে যায়নি। প্রসঙ্গটা কিভাবে যেন উঠেছিল মনে নেই। এক পর্যায়ে শামীম বলে– দোস্ত, সেদিন তোমার পরনের শাড়িটা ছিল সবুজ, খুব তাজা সবুজ।

আমি চমকে যাই– শাড়ির রঙটাও তোমার মনে আছে?

– হ্যাঁ। সবুজ। পাড়টা লাল। এ দু'টো রঙের মিশেল কি ভুলে যাওয়া সম্ভব! বিশেষ করে একজন বাঙালির পক্ষে?

সামান্য ক'টি বাক্য, কয়েকটি মাত্র শব্দ, অথচ কী যে হয়ে যায় আমার ভেতরে। আশ্চর্য, এতগুলো বছরের এত হাজার হাজার দিনের লক্ষ লক্ষ ঘণ্টার দীর্ঘ সময়ে কথাটা একবারও আমি ভাবিনি। কেন ভাবিনি?

আমাদের জাতীয় পতাকার, আমার মাতৃভূমির, আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, অনবদ্য লাল-সবুজ কম্বিনেশনের শাড়ি আমার খুব কম বয়স থেকেই পছন্দের। প্রায়ই পরি। এখনও। লাল শাড়ি সবুজ পাড়। সবুজ শাড়ি লাল পাড়। পাড়হীন সবুজ থান অথবা পাড়হীন গাঢ় লালও, সময়ে সময়ে। কিন্তু বহুদিন আগেকার সেই ঘটনাটির সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া এই প্রতীকী বর্ণ-সমন্বয়টি আমার মনে কখনও উদিত হল না কেন, সেটাই বিস্ময়ের। শামীম আজ এতদিন পরে কী কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে! আমি কি বাংলাদেশ!

হ্যাঁ, আমি একটা দেশ। বাংলাদেশ। আজ থেকে উনিশ বছর আগে, যখন আমার বয়স ছিল চব্বিশ, আর আমি শেষ জুলাইয়ের এক মধ্যদুপুরে স্বাধীন বাংলাদেশেই প্রথমবারের মত ধর্ষিত হই– তখন আমার পরনে ছিল লাল পাড়ের তাজা কিন্তু গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি। টাঙ্গাইলের তাঁত। আহা, ঐতিহ্য। সেদিনের কোনও কিছুই ভুলে যাবার কথা নয়। আমি ভুলিওনি। কিন্তু শাড়ির রঙ-টঙের ব্যাপারটা কেমন যেন আবছা হয়ে এসেছিল স্মৃতিতে। অথবা তেমনভাবে স্মৃতিতে আঁচড়ই কাটেনি বিষয়টা।

– তুই আমার বাড়ি থেকেই গিয়েছিলি।

শামীমের কথায় আমি নিজের মধ্যে ফিরে আসি– হ্যাঁ। তুমি তখন নীলক্ষেত কোয়ার্টারে সাবলেট থেকে ল্যাব এইড ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে কাজ কর।

– হুঁ। অফিস সেক্রেটারি ছিলাম। কোম্পানি সেক্রেটারিও, সাকুল্যে ওই একটা অফিসই তখন ওদের কোম্পানির ছিল তো।

আমি একবার শামীমের দিকে তাকাই। সেদিনের স্বল্পায়তন প্রতিষ্ঠানটির অফিস সেক্রেটারি শামীম খন্দকারকে আজকের শামীমের ভেতরে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য বদলে গেছে প্রতিষ্ঠানটিও, অনেক বড় হয়েছে। তবু সেখানকার 'চাকুরে' হিসেবে আজ শামীমের অবস্থান অকল্পনীয়। আজ সে ওরকম ব্যবসার কমপক্ষে বিরাট শেয়ারের মালিক হতে পারে। আমি তার কথার জের ধরি– আমি তোমার বাসায় তৈরি হয়ে কোথাও যাবো বলে তুমি আধাবেলা ছুটি নিয়েছিলে।

– কারণ আমি জানতাম দিনটা তোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ল্যাবএইড তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত ছোট একটা ডায়াগনোস্টিক সেন্টার। আজকের বিশাল হাসপাতাল-ভবন তখন কল্পনারও বাইরে। তিন তলা ভবনের ওই পরীক্ষাগারে কাজের ব্যস্ততা বলতে গেলে ছিলই না। আমার সব মনে পড়ে। বলি– ওই টেবিলে বসে থেকে তুমি খুব বোর হতে তখন।

– হ্যাঁ। ওটার মালিকের নামও শামীম। ডা. শামীম। নামের সূত্রে খানিকটা সৌহার্দ থাকায় শামীম ভাইয়ের অনুমতি পেয়েছিলাম সহজে। কোম্পানি-সচিবের মাছিমারা দায়িত্বের টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছিলাম দুপুর বারোটার পরপরই।

– হুঁ।

– হুঁ মানে কী। তোর জন্যই করেছিলাম সব। অকৃতজ্ঞ।

ওর উষ্মার মুখে আমি আর কোনও শব্দই করি না। আমাদের আড্ডার তৃতীয় সদস্য, শামীমের বান্ধবী নাজনীন আমাদের আলাপচারিতা সবিস্ময়ে শুনছিল, নীরবে। খানিক পরে শামীম আবার সক্ষোভে বলে– আমি জানতাম দিনটা তোর বিশেষ দিন।

হুঁ।

আবার হুঁ। আমি কিন্তু জানতাম দোস্ত, সেদিন ঘটবে।

এবার শামীমের উচ্চারণে ক্ষোভ নেই, বরং নির্বিকার সে। কিছুটা কি কৌতুকপ্রবণও? কেন যেন আমার সুক্ষ্ম একটা অপমানবোধ হয়– কী অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলো শামীম। 'ঘটবে'। কী ঘটবে?

এটা অশ্লীল ইঙ্গিত? যাহ্ শালা। যার জন্য করি চুরি...। কামখান বানাইতে পারলা তোমরা, আমি আন্দাজ করতে পারলেই দোষ।

আবার বাজে কথা?

কথা যেরকমই হোক, আমি একশো ভাগ সিওর ছিলাম, জানতাম যে ওই দিন অঘটনটা ঘটবেই।

মাই গড, তুমি এত নিশ্চিত জানতে? আমি তো কিছুই জানতাম না। তুমি কি করে...

ওসব বোঝা যায়, কাঞ্চনমালা।

শামীমের মুখে আমাকে 'কাঞ্চনমালা' ডাকতে শুনে আমার কোনও স্মৃতিমেদুরতা তৈরি হয় না, কারো প্রতি ক্ষোভ কিংবা ঘৃণাও না। হাসি পায়। একদা এক যুবক আমার 'মালা' নামটিকে অলংকৃত করিয়া কাঞ্চনমালা বলিয়া আহ্বান করিত বটে। সুমিত। সুমিত ফায়জুল্লাহ। কী ছিল তার ঢলোঢলো আবেগ! বাথটাব ভর্তি সুগন্ধী সাবান-ফেনার মত। কিন্তু শামীম তো মনে হচ্ছে আজ আমাকে এই বিদঘুটে প্রসঙ্গ-কচলানো থেকে রেহাই দেবে না কিছুতেই। দেড় হাত দূরত্বে মুখোমুখি বসে সে যেন কোনও এক দূরাগত গলায় স্বগতোক্তি করে– রওনা দেবার আগে আমার রুমে এসে তুই যত্ন করে গাঢ় লাল টিপটা কপালে দিলি। সঙ্গে ম্যাচ করে লিপস্টিক... টিপটপ ড্রেসআপ...

– তুমি শামীম, মুখস্ত করে রেখেছ ওই সব!

– কেন, অস্বাভাবিক? বলতে চাস তোরও মুখস্ত নেই! মনে পড়ে না এখনও?

আমি জবাব দেই না। চুপ থাকি। একসময় চোখ বুঁজে মুখটা আকাশমুখো তুলে ধরি। যেন এক্ষুণি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে, মুখটা ধুইয়ে দেবে। বৃষ্টি নামে না। নাজনীন অধৈর্য হয়ে এসময় বলে– অনেক হয়েছে ভাই। তোমরা এবার দু'জনেই উনিশ বছর পেছন থেকে আজকের দিনটাতে ফিরে আসো তো।

ওর কথা শুনে হঠাৎ শামীম হাসতে থাকে। আমিও। নাজনীনও। যে যার নিজস্বতায়, আনন্দে, স্বস্তি বা অস্বস্তিতে, অর্থহীনতায় বেশ কিছুক্ষণ হাস্য-আক্রান্ত থাকি। এরপর একসময় থিতিয়ে আসে যার যার নিজস্ব অনুভূতি। খানিক আগের ঝলমলে বিকেলটা কেমন যেন বিমর্ষতায় মরে আসতে থাকে। জাতীয় জাদুঘরের ভেতরের পুকুরটা কমলারঙের মিহি সরভাসা পানি বুকে নিয়ে স্থির হয়ে আছে। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যরশ্মি তির্যকরেখায় পুকুরের পানিতে পড়ে কেমন একটা সব্জে-কমলা রঙ ধরেছে। আমরা তিনজন পুকুরপাড়ের সবুজ মাঠে বসে থেকে নিজেদের চিনতে পারি না। অথচ বহুদিনকার যোগাযোগহীনতাকে দূর করে দেবার জন্যই আমরা খুব উদার প্রকৃতির স্পষ্টতায় খোলা আকাশের নিচে বসেছিলাম; শামীম বারবারই কাছের কোনও চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও। শুধু তারুণ্যের স্মৃতিমেদুরতার কারণেই এই প্রান্তরবিহার। না হলে বয়স এবং তথাকথিত পদমর্যাদার দৌরাত্ম্যে আমাদের জীবন থেকে সাধারণ দিনযাপনের আনন্দ অন্তর্হিত হয়েছে বহু আগে। আমি চারপাশে চোখ ফেলি। দূরে দূরে ছড়ানো নানান গাছপালা। এ মুহূর্তে এই বৃক্ষমালাদের মত আমরাও আমাদেরকে অনড় বলে বোধ করি। তিনজনই চুপ করে যাই। যেন আমরা সত্যিই গাছ হয়ে গেছি। ভাষাহীন। দূরের গাছগুলো মাটির গভীরে চলে যাওয়া শেকড়ের বন্ধনে আঁটো, তবে অতি নিকট-সান্নিধ্যে বসা এই মনুষ্য-গাছ তিনটির কাণ্ডগুলো হাঁটু ভেঙে জুবুথুবু হয়ে জমে পড়েছে বুঝি। শেকড় নেই। আমরা মাঠের দুর্বাঘাসের ওপর বসেছিলাম।

একটু দূরে, মাঠের অন্যপাশে কয়েকটি শিশু-কিশোর কল্পিত পিচের দু'প্রান্তে পরপর চার পাঁচটা করে ইট বসিয়ে স্ট্যাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। বিপদজনক স্ট্যাম্প, কিন্তু বাচ্চাদের মুখে ভীতি বা দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই। এসময় আমাদের নীরবতার অখণ্ডতায় একটা ঢিল পড়ে। আচমকাই। ওদের একটি বল ব্যাটের আঘাতে উড়ে এসে আমার ঠিক ডান হাঁটুতে লেগেছে। ক্ষুদে খেলোয়াড়দের হল্লা উঠলে আমরা আবার ধুলোওড়া বিকেলটাতে ফিরে আসি। আমি বলটা হাতে নিয়ে ওদের হাত ইশারায় ডাকি। খুব দ্বিধার সঙ্গে একজন এগুচ্ছে। হাতে ব্যাট। স্ট্যাম্পের কাছে ব্যাট হাতে আরেকটি ছেলে। তার পাশে বড় জোর ন'দশ বছরের একটি মেয়ে। কী মায়াবী মুখটা তার! খুশির হাসিতে চোখ দুটো বুঁজে আসার যোগাড়। হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। তার কথা শুনতে পাচ্ছি– আমাকে তো খেলতে নাও না। এই জন্য। এইজন্য বিচার হইছে।

আগুয়ান ছেলেটি সম্ভবত 'বিচার'-এর ভয়েই মুখ শুকনো করে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। শামীম গম্ভীর গলায় বলে– কী ঘটনা? ছেলেটি উসখুশ করছে। শামীম আবার বলে– ঘটনাটা কী, বল নিতে এসেছ?

নাজনীন হেসে ফেলে– বেচারা ভয় পেয়েছে। শামীম আবার রহস্য করে আমাকে দেখিয়ে বলে– ভয়ের দেখেছ কী, শোন ছেলে, এই ম্যাডাম যে খুব রাগী, তা জানো?

ছেলেটি না বোধক মাথা নাড়ে।

– এই রাগী ম্যাডাম যদি সত্যিকার রেগে যায়, তাহলে তোমাদের খেলাটা একদম খেয়ে হজম করে ফেলবে, বুঝলা?

– কী খেয়ে ফেলবে? এতক্ষণে বিস্মিত মুখে কথা ফুটল ছেলেটির।

– তোমাদের খেলাটা।

– খেলা-টা? খেয়ে হজম?

হ্যাঁ ব্যাট-বল-স্ট্যাম্প সব। বেশি রাগ করলে উনি হাতের কাছে যা-ই পান, তাই খেয়ে ফেলেন।

তারপর আমার দিকে চেয়ে উদাস গলায় বলে– নিজের রাগটা খেতে পারেন না তো! এজন্য।

এবার সম্ভবত কৌতুকটা ধরতে পারল ক্রিকেটার। সে মুচকি হেসে আমার দিকে হাত বাড়াল বলটার জন্য। বলল– আমরা সরি আন্টি। আপনি কিন্তু খুব বেশি রাগ কোরেন না।

আমরা এবার নিজেরাই হাসতে লাগলাম। ছেলেটা বল হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে গেল। অনেকক্ষণ ধরে খেলা বন্ধ রেখে ওদের হাসাহাসিই চলছে, দেখলাম। বিকেলটা ফের তার নিজস্বতা নিয়ে ফিরে এসেছে শাহ্‌বাগ অঞ্চলে। আমাদের মধ্যেও কি ফিরে আসে প্রত্যেকের নিজ নিজ দিনরাত, ভিন্ন ভিন্ন জীবনযাপনের অশ্রুত পাঁচালী! কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা, সম্পূর্ণ ভিন্ন তিনটি বাস্তবতার প্রতিনিধি, কিছু কমন বিষয় নিয়ে মামুলি আলোপচারিতায় অংশী হয়ে উঠি। একটু পরেই জাদুঘরের ডেপুটি কীপার ড. নীরু শামসুন্নাহারকে আসতে দেখা যায়। মুখে উজ্জ্বল আভা। তার সম্প্রতি পাওয়া দু'বছর মেয়াদী জাপানের স্কলারশিপসহ ভিসা প্রাপ্তির খবর এবং আগে থেকে জানা তার সদ্যসূচিত সপ্রেম দ্বৈত-জীবনের তথ্য আমাদের দারুণ আনন্দিত করে, অথবা নিজেদের কিছু কিছু না-পাওয়ার ক্লেশকে অধিকতর গভীর করে। আমরা তাকে উইশ করি, সঙ্গে থাকা মিষ্টি সকলে মিলে খাই। নিমকিভাজা খাই, বোতলের পানিতে তৃষ্ণা দূর করি। নানান বিষয়ে কথা চলতে থাকে। মিনিট চল্লিশেক পরে নীরু আপা 'মোশারফ ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে, না হইলে আরো অনেকক্ষণ থাকতাম' বলে উঠে গেলে আবার তিনজন একা হয়ে পড়ি।

শামীমের বহু দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে। আজ সে নিউইয়র্ক তো পরশু ব্রাসেলস। এক সপ্তাহ পরেই হয়তো সে ফ্রান্সে, পরের মাসেই থাকতে পারে হংকং। কয়েক মাস ধরে সে বাংলাদেশে আছে। সম্প্রতি সে বিরিশিরিতে বিঘা দশেক জমি কিনেছে। আরো পনের বিশ বিঘা কেনার ধান্দায় আছে। আপাতত কিনে ফেলা জমিতে ছোট একটা ট্যুরিস্ট-রিসোর্ট আর বৃদ্ধাবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে ফেলেছে। মহাব্যস্ত লোক।

নাজনীনের ব্যাপারটাও জানা গেল। সম্প্রতি নিঃসঙ্গ হয়েছে সে। বিয়ে হয়েছিল পারিবারিকভাবে। ছেলে রূপে গুণে বিদ্যায় ছিল অতুলনীয়। মনকাড়া সুন্দরী নাজনীনও মেধায় নান্দনিকতায় চূড়াস্পর্শী। সোনায় সোহাগা। কিন্তু স্বামীধনের গুণপনার অলিগলিতে বিচরণ করতে গিয়ে সে যখন আবিষ্কার করে যে, প্রতিরাতে স্বামী তাকে কিশোরীসুলভ কিছু ব্রীড়াভাঙার ক্রীড়াশৈলীতে আবিষ্ট রাখবার চেষ্টা করে ঘুম পাড়াতে চায়, অভিযাত্রার প্রান্তদেশে পৌঁছতে উদ্যোগী হয় না, তখন সে সংশয়ে পড়ে। লোকটি কি শারীরিকভাবে অক্ষম! মগজে কেউটের মত ফণা তোলা এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু সে অচিরেই পেয়ে যায়। দেহ আর মনের বিবাদভঞ্জন হয়– নাহ, অমূলক সন্দেহ। বরং পারঙ্গম স্বামীপ্রবর নিজের দাদীর কাছে শোনা স্বামী-স্ত্রীর মিলনবিষয়ক অব্যর্থ প্রবাদটি তাকে শোনায়– 'মাসে এক, বছরে বারো, এর থাইককা যে যত কমাইতে পারো।' নাজনীন বিশ্বাস করেছিল। তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত বহু রাতেই সে স্বামীর ঔদাসীন্যে তেমন দোষ দেখেনি। আর দীর্ঘ বিরতিতে যেদিন প্রত্যাশিত সন্তরণ ঘটেছে, সেদিন তার মত সুখী আর কেউ নয়। ভালই কাটছিল। মন্দের ভাল। দু'বছর আগে স্বামী যখন উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য ইংল্যান্ড পাড়ি দেয়, তখনই সে প্রথম জানতে পারে যে লোকটি সম্পর্কে তার জানাশোনায় ফাঁক থেকে গেছে। ইংল্যান্ডে সে একা যায়নি। সঙ্গে স্বামীর কৈশোরোত্তীর্ণকাল থেকে সখ্যের সম্পর্কধারিণী একজন দু'সন্তান-শোভিত বিধবা যুবতী মাতাও গিয়েছেন। সন্তানসহ তার ভিসা অবশ্য আলাদাভাবে হয়েছে। তার বাচ্চারা ওখানে পড়াশুনো করতেই যাচ্ছে।

নাজনীনের সঙ্গে তার স্বামীর বিয়েটা ছিল পরিবারের চাপে। এ বিয়ের ফলে তাদের পূর্বসম্পর্কের কোনও বিরতি ঘটেনি। সবকিছু জানাজানি হলে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে জেগে-কাটানো উপোসী রাতগুলো তার চোখে টেঁটাবিদ্ধ করে বুঝিয়ে দেয় সত্য কী। তারপরও সে চেষ্টা করেছিল। বৃথা। দু'বছর প্রকৃত প্রোষিতভর্তৃকার জীবন কাটানোর পর সম্প্রতি তালাকের নোটিশ এসেছে। যে ফ্ল্যাটটিতে সে এখন বসবাসরত, সেটি দেনমোহরের হিসাবে ফেলে নাজনীনের নামে লিখে দিয়ে স্বেচ্ছায় মুক্তি নিচ্ছে তার প্রবাসী স্বামী। দেনমোহর এবং তিনমাস দশদিনের ইদ্দতকালের খোরপোশের খরচের অন্তত আট নয় গুণ বেশি হবে ফ্ল্যাটটির দাম। কিন্তু নাজনীন এই প্রাপ্তির হিসাব বুঝিয়ে অনির্বাণ জ্বলতে থাকা মনকে শান্ত করতে পারে না। অপমান। তীব্র অপমান অবিরত দংশনে তাকে মৃত্যুমুখী করে ফেলছিল।

এ অবস্থায় ঘটনাক্রমে দেশে এসেছে শামীম, সঙ্গ দিচ্ছে নাজনীনকে। অথবা শামীমকে সঙ্গ দিচ্ছে নাজনীন। বন্ধু হিসেবে পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতা হয়ে উঠছে। ফেরার পথে কলাবাগানে আমার বাড়িতে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যায় ওরা। আমার বাচ্চাদের জন্য অনেক খাবার আর গিফট কিনে দিয়েছে শামীম। কিন্তু সময়ের তাড়া বলে ওরা আমার বাড়িতে নামে না, রওনা দেয় উত্তরার দিকে, নাজনীনের বাড়ির উদ্দেশ্যে। শামীম কিছুদিন ধরে নাজনীনের ফ্ল্যাটে থাকছে। আমি দেখি, আমার বন্ধু শামীম তার বন্ধু নাজনীনকে নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে জনাকীর্ণ রাজপথে। কিন্তু শামীম কি জানে, কী মারাত্মক একটি জখমের চাপাথাকা মুখ সে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুলে দিয়ে গেছে আজ!

সে দিনটা অন্য দিনগুলো থেকে ভিন্ন ছিল।

গরম কালটা আমার অপছন্দের। কিন্তু শেষ জুলাইয়ের সেই অসহ্য গরমেও নিজেকে আমার ফুরফুরে লাগছিল। আমার বন্ধু... দীর্ঘদিনের বন্ধু, যাকে আমি খুব মামুলি মেয়েদের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসি– আজ আমাকে নিভৃতে ডেকেছে। আমরা বহুবছর বন্ধুত্ব রক্ষার দূরত্বে থেকেছি, তার বিভিন্ন নারী বা তরুণীবিষয়ক গল্প, তা প্রেম বা নিছক কামের তাড়নাতেই হোক– আমি শুনেছি। জানি। আমার রক্ষণশীল প্রেমপ্রবণতাও জানে সে। আমাদের সম্পর্কটা নিয়ে একটা ধূম্রজাল রয়েছে বন্ধুদের মধ্যে। কেউ বলে, আমি সুমিতের পেছনে অর্থহীন মোহে সময় নষ্ট করছি। কেউ বলে সুমিত আমাকে খেলাচ্ছে, লক্ষ্যে পৌঁছামাত্র কেটে পড়বে। বন্ধুরা, বিশেষত মেয়ে বন্ধুরা আমার ব্যাপারে খুবই শংকিত। তারা মনে করে, আমি সুমিত ফায়জুল্লাহর মত একটা চিহ্নিত প্লেবয়ের পাল্লায় পড়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করতে যাচ্ছি। আমি জানি প্রকৃত সত্য। ভুল শুদ্ধ যা-ই হোক কাজটা আমি করেই বসেছি। সুমিতকে ভালবেসেছি। বাইরে অবশ্য আমি এর তীব্র বিরোধিতা করি। সুমিতও। সে কী বুঝে আমাদের প্রেমসম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনাকে শ্রেফ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয় জানি না। তবে আমিও ঠিক তারই মত করে সবকিছু অস্বীকার করি। কারণ সকলের মনোযোগ সরিয়ে দিয়ে আমি ওকে সত্যিকারেরই পেতে চাই। এরপর জানতে পেরে চমকে উঠুক সবাই। তবে মেলামেশার ব্যাপারে আমি খুবই সাবধানী। আগামী মাসে আমার চব্বিশ পূর্ণ হবে। এখনও আমি কোনও পুরুষের শারীরিক সাহচর্যে যাইনি। দীর্ঘ ছয় বছরের বন্ধুত্বে সুমিত পর্যন্ত কাছ ঘেঁষতে পারেনি। কত গান, কত সাংগঠনিক কাজ, ডাকসু সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান আমরা একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে করেছি। আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি শুধু দু'জনে, আমি যে চাচাজির বাড়িতে থাকি, সেখানে। কোনও নির্জনতার প্ররোচনাতেই সে বন্য হয়ে ওঠেনি। অথচ কত কথাই ওর লাম্পট্য সম্পর্কে আমি শুনেছি।

সুমিতের আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবে আমি সানন্দে রাজি হয়েছিলাম। তবে কথাটা যাতে কোনওভাবেই প্রচার না হয়, সেদিকে আমরা দু'জনেই সতর্ক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুমিত অন্য সাবজেক্টের ছাত্র আমাদের ইয়ারেই। তার একাডেমিক রেজাল্ট খুব সাধারণ হলেও সে কোনও বিচারেই সামান্য নয়। সুমিতের বাবা দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ। সে নিজে সংগীত শিল্পী। সম্প্রতি সিনেমার প্লেব্যাকও শুরু করেছে। আমার অনার্সের রেজাল্ট আশানুরূপ, একই পর্যায়ের রেজাল্ট এমএ-তেও হবে আশা রাখি। এরপর তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত পাকা হয়েই আছে। স্বপ্নের জীবন পেয়ে যাব বাস্তবে। কঠিন সংগ্রামের দীর্ঘ জীবন থেকে বিদায়। আমি এখন নিজের উপার্জনে পড়ি। পার্টটাইম কাজ করি দু'টো জাতীয়

দৈনিকে। অনেকে ছাত্র পড়াতে বলে। আমার পোষায় না। শিক্ষকতা একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু করব। সুমিত আমার এই ডিটারমিনেশনটা খুব সম্মান করে। সীমাহীন প্রতিকূলতায়ও হাল ছেড়ে না দেবার দৃঢ়তাকে সম্মান করে। আরেকটা ব্যাপারে আমার আশ্চর্য লাগে– ও তার সমস্ত গোপন কথা, লোভ, ঈর্ষা, ভবিষ্যত-ভাবনা এমনকি অপরাধবোধের কথাও আমাকে জানায়। আমি মাঝে মাঝে সংশয়ে পড়ে যাই। ও কি আমাকে সত্যিই ভালবাসে? নাকি এ কেবল কথামালা? আবার বিভ্রান্ত লাগে– ভালো না বাসলে কেউ কাউকে এত চায়? এতো কিছুতে জড়িয়ে নেয়! মাঝে মাঝে আমার সম্পর্কে সুমিত বন্ধুদের কাছে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে, যার মর্মার্থ হচ্ছে– আমি একটা খুব অন্যরকম চরিত্র। মামুলি মেয়েদের মাপকাঠিতে আমাকে বিচার করা যাবে না। এগুলো কি স্তুতি? সে চিঠিতেও আমাকে লেখে– 'কাঞ্চনমালা, আমার প্রতি আপনার কোনও তুচ্ছ অধিকারবোধ নেই বলেই আপনার অধিকার আমার ওপর সবচাইতে বেশি। সম্পর্কের ভেতরকার দাবি মানুষের সম্পর্ককে জীর্ণ করে। আপনাকে এত বেশি ভাল লাগার এটা অনেক বড় কারণ যে আপনি অনাবশ্যক দাবির কথা তুলে আমাদের অসাধারণ সম্পকটা জীর্ণ করেন না।'

হ্যাঁ– আমি হয়তো সুমিতের কথাগুলোর মতই একটা চরিত্র। আমি এখন পর্যন্ত কিছু চাই না ওর কাছে। সে-ও না। কিন্তু চাওয়া কি নেই, এমনকি দাবি? আমি আপনমনেই হেসে ফেলি। সে-ও তো মুখে কিছু উচ্চারণ করে না। কিন্তু গত মাসখানেক আগে এই প্রথমবারের মত, ফাঁকা বাড়িতে বড় চাচাজির বেডরুমে আমরা যখন আচার খুঁজছি, পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আচমকা একটা চুমু খেয়ে ফেলেছিল সুমিত। দীর্ঘ সময়ের চুমু। আমি আচারের বয়াম রাখবার সেল্‌ফটাতে খুঁজে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে মুখটা অন্যহাতে ঘুরিয়ে গ্রাস করতে শুরু করেছে ঠোঁট দুটো। দম আটকে ছটফট করতে শুরু করার আগে পর্যন্ত ছাড়েনি। আমি ক্ষুণ্ন হয়েছিলাম। প্রতিক্রিয়ায় এক সপ্তাহ আর দেখা করিনি। সেও সাহস করে আমার বাসস্থানে আসেনি। একটা চিঠি পেয়েছিলাম সে-সময় তার। অনেক কথার সঙ্গে লিখেছিল যে, 'আমরা দু'জন পরস্পরকে ভালবাসি আর বিষয়টাও উপভোগ না করার মত কিছু ছিল না, তবে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কী।' এও লিখেছিল– 'এরকম একটা ঘটনার জন্য কান্নাকাটি করাটা কোনও সোলেমানীয় ব্যাপার না।' আচ্ছা, 'সোলেমানীয়' কী? কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। এবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। আরেকটা ভয় হচ্ছে– এবারও কি একবার সেদিনের মত দুঃসাহস করে ফেলতে পারে সে? ভাবতেই আমার গায়ে শিহরণ বোধ করি। বজ্জাত। এবার ওকে কাছে আসার সুযোগই দেয়া যাবে না। অবশ্য সে নির্জনতাও আজ পাবে না। আমরা যে বাসায় দেখা করব, সেটা আবৃত্তিকার দম্পতি ফরহাদ-নাবিলার। ফরহাদ ভাই আর নাবিলা আপা দু'জনেই চাকরিজীবী। তাদের বাসায় আমি আসব জানালে নাবিলা আপু বলেন– সুমিতও আসবে শুনলাম?

– হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো এখনও তোমাকে সেটা বলিনি। জানলে কিভাবে।

– ফরহাদ বলেছে। আসো দু'জনেই। কিন্তু মালা, যত দ্রুত সম্ভব সম্পর্কটার পরিণতি ঠিক করে ফেলো। সুমিত খুব অস্থির ধরনের ছেলে।

– কী করব?

– কী করব মানে? আমরা কি করেছি, আমি আর ফরহাদ? জগতের আর সব জুটিরা কী করে? বিয়ে করবে। সরাসরি ওকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বলবে এবার।

নাবিলা আপার কথার যুক্তি আমাকে প্রভাবিত করে। সুমিতের সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়ে একমুখী সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে আমি তার মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় থাকি।

বাজে ধরনের গরম পড়েছিল সেদিন। বকশিবাজার এলাকায় নাবিলা আপার শ্বশুরবাড়ি। বাড়িটায় তিনতলার ছাদে আরেকটা ফ্লোর করে গোটা অর্ধেক অংশ জুড়ে একটা এ্যাপার্টমেন্ট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি অর্ধেকটা ছাদ যেন স্নিগ্ধ উঠান। চারপাশে টবের বাগান। ফুলের, ফলেরও। কিন্তু এ মুহূর্তে চারতলার কংক্রিটের উঠান রোদে জ্বলছে। দু'জোড়া ক্লান্ত পা দু'টি পরিশ্রান্ত মানুষকে সেই আঙিনাতে এনে পৌঁছায়। সুমিত আর আমি অথবা আমি আর সুমিত। তবু রক্ষা, চলে তো এলাম। স্বস্তি।

স্বস্তির কথা ভাবতে না ভাবতেই আমার মাথায় একটা চক্কর দিয়ে উঠল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় বিশাল এক তালা।

আমার মনে হল ক্লান্তি যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। ইচ্ছে করছে কয়েক পা পিছিয়ে ছায়াচ্ছন্ন সিঁড়িঘরেই বসে পড়ি। হঠাৎ চোখে পড়ে, তালার আঙটায় একটা কাগজ গুঁজে রাখা। দ্রুত ভাঁজ খুলি। নাবিলা আপার লেখা– 'মালা, দুঃখিত। ভোরবেলা খুব জরুরি খবর পেয়ে নরসিংদী যেতে হচ্ছে। মা অসুস্থ। রাতের আগে ফিরতে পারব না, ওখানে আজ থেকে যেতেও হতে পারে। তোদের বোঝাপড়াটা আরেকদিন হোক। অবশ্যই, আমার বাড়িতেই হোক। দুঃখিত সোনা।'

আমি হতাশ হয়ে সুমিতের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হই। তার মুখে চিন্তার ছায়া নেই। এবং অচিরেই পকেট থেকে চাবি বের করে সে গেট খোলে। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সতর্ক হই। গলা খাটো করে বলি,

– অ্যাই, কিভাবে?

– ফরহাদ ভাই। চিরকুটে লেখা খবরটা সকালে আমাকে জানালে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম...।

– কী রিকোয়েস্ট?

– বলেছিলাম, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আজকেই কথা বলা খুব জরুরি।

– নাবিলা আপা?

– জেনে থাকতে পারে, না-ও জানতে পারে। এটা তাদের ব্যাপার। আমরা তো আর লুকিয়ে চুরি করতে আসিনি।

– তবু

– তবু কী। খোদ গৃহকর্তাই তো চাবিসহ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। নাকি?

– ধূর। কেমন যেন হয়ে গেল না?

– হ্যাঁ। খুবই 'কেমন' হয়ে গেল। এস ভেতরে।

জ্বলতে থাকা দুপুরের ঝাঁজ থেকে স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক ফ্ল্যাটটিতে ঢুকে আমি মুগ্ধ হই। সুমিতও। ঘুরে ঘুরে দ্যাখে ঘরগুলো। বেডরুমটায় ঢুকতে গিয়ে সুমিত একবার পেছন ফিরে তাকায়– এসো।

ও সবসময় আমাকে 'আপনি' বলে। আমিও। আজকে সেই প্রথম থেকেই 'তুমি' বলছে। বিনা কারণেই কেমন একটা ভয় হয় আমার। দ্বিধার সঙ্গে বলি– একজনের অনুপস্থিতিতে তার বেডরুমে ঢুকে পড়া উচিত হয়?

– আরে কী মুশকিল। এ বাড়িটা পুরোটাই আজ আমাদের জন্য বরাদ্দ আছে তো।

– তবু

– আবার তবু। বিছানার পাশে ড্রেসিং টেবিলের সেটিংটা দারুণ না?

সত্যিই দারুণ। এ সংসারে অনেক কিছুই দারুণ। কিন্তু আমরা এসব 'দারুণ গৃহসজ্জা' কতক্ষণ দেখবো? কথা বলা জরুরি। নিজেদের ভবিষ্যত-পরিকল্পনার কথা। এসব ভাবতে ভাবতে টুকটাক দু'চারটা কথা হয়। কিছুটা সময় কেটে যায়। তারপর একসময় হঠাৎ করেই সুমিত আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি চমকে উঠি। সে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। একজন সম্পূর্ণ আলাদা সুমিত আমাকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে তীব্র চুমু খেতে থাকে। অজস্র চুম্বনে বিবশ হয়ে যেতে যেতেও আমি সংকুচিত হয়ে পাড়ি। অন্যদিকে আমার সাধের পাটভাঙা টাঙ্গাইলের শাড়ি, সাথে রঙমেলানো যাবতীয় আবরণ তার কাছে বাহুল্য মনে হয় বুঝি। সে ক্ষিপ্র হাতে সে-সব অপসারণে ব্যস্ত হয়। আমি একটি মরিয়া প্রাণির মতই প্রতিরোধ করতে থাকি। আজন্ম যত্নলালিত সংস্কার আমাকে আমার সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত মানুষের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধে অবতীর্ণ করে। এই যুদ্ধ ততক্ষণে শয্যায় পৌঁছেছে। এক সময় সমস্ত শরীরে অনিচ্ছার মুদ্রা নিয়ে বিছানায় আমাকে কুঁকড়ে থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সুমিত– এ সবের কী মানে মালা, এটা কী রকম আচরণ?

– এই কথা তো আমি জিজ্ঞেস করব আপনাকে।

– না, করবে না। এটাই স্বাভাবিক।

– না।

– তাহলে চল, ফিরি।

সুমিতের ফিরে যাবার প্রস্তাব শুনে আমার অন্তর আর্তনাদ করে ওঠে– ফিরি মানে? আমরা কি এসবের জন্য এসেছিলাম? আমরা কথা বলব না?

– অবশ্যই বলব। অনেক কথা বলার আছে আজ। একটু সহজ হও।

আমি সহজ হবার চেষ্টা করি। সুমিতও অনেকটা শান্ত, আমার অন্তত তাই মনে হয়। অভয় দেবার ভঙ্গিতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ আমরা এভাবে থাকি। তার আলিঙ্গনের মধ্যে থাকতে থাকতেই আমি ক্রমে তার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে আসা টের পাই। এবং আর কিছুক্ষণ পরেই সে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে আবার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তার প্রাণের 'কাঞ্চনমালা' এবার তার আগ্রাসী পৌরুষের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় তার।

এরপর ক্লান্ত দেহে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমিত। কোনও কথা বলে না। আমার ভেতরে অকারণে একটা ভয়-শিরশিরে অনুভূতি হয়। আর এত অসহায় লাগে! নিজেই বুঝতে পারি না কখন নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছি।

– এতে কান্নাকাটির কী হল...।

আমি আহত বোধ করছি, তবুও বলি– সরি ।

– সেদিন একটা চুমু খাওয়ার পরও তুমি কেঁদেছিলে। এসব কী ন্যাকামো। নাকি বুঝাতে চাও এর আগে কেউ তোমাকে চুমুও খায়নি!

সুমিত ব্যঙ্গ করে বললেও কথাটা সত্যি। কিন্তু এ মুহূর্তে তথ্যটা অর্থহীন লাগে, ওকে তা জানিয়ে কী হবে। বরং তার চোখমুখে নির্মমতার অভিব্যক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি। সুমিতকে আমি চিনতে পারি না। ওর কণ্ঠস্বর, আমার এত প্রিয় কণ্ঠশিল্পীর নিয়মিত রেওয়াজের স্বর এতো কর্কশ! আমার কান্নার বেগ দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিই। মনে হয় যেন অন্য কেউ আমার গলায় মরিয়া হয়ে বলছে– এসব কী বলেন আপনি।

– হ্যাঁ, ঠিকই তো বলছি। তুমি এত খুকি নাকি। সেদিনের সামান্য একটা চুমুতেও তুমি ক্ষয়ে গিয়েছিলে?

আকাশ-পাতাল খুঁজেও এ প্রশ্নের জবাব আমি পাই না। কিন্তু ঠেলে ওঠা কান্নার দমকটা এবার আর সামলাতে পারি না আমি। উপুড় হয়ে দু'হাতের ওপর মুখটা রেখে কাঁদতে থাকি। শুধু বেডকভারটাই আমার শরীর ঢেকে রেখেছে। খানিকটা সময় ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটে। আবার সুমিতের গলা শোনা যায়, এবারে অনেকটাই কোমল– শোন।

আমার অভিমান হয়। হায় আল্লাহ, এরপরও আমার অভিমান হয়! কিন্তু সত্যিই হয়েছে তো। আমি সাড়া দিই না। আমার তলপেটে খুব ব্যথা, দুই উরুর মাঝখানের গহীনে তীব্র জ্বালা। বরফঠাণ্ডা পানিতে যদি এক্ষুণি গোসল করা যেত! কিন্তু আমি উঠব না। ও বেরিয়ে যাক এ বাড়ি থেকে। তারপর উঠে, অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে ধুয়ে ফেলে দেব সমস্ত ক্লেদ। সুমিত অপরাধী। সুমিত অপরাধী। আমাকে ফাঁদে ফেলে কলংকিত করেছে সে।

– শোন, মালা। জরুরি কথা আছে।

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি সে বেশ শান্ত। আমার মনে হয় যেন কিছুটা আপোসের বা অনুতাপের ভাব ফিরে এসেছে তার মধ্যে। আমি চোখভরা পানি নিয়ে ওর দিকে তাকাই। এখন যেভাবেই হোক, আমি তাকে মনস্থির করাব। আমি তাকে সরাসরি জানাব যে আমার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না। আমরা আজ হোক কাল হোক দ্রুত বিয়ে করব। এরকম একটি ঘটনার পর আমার শরীর-মন আর কারো হতে পারে না। ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ একটা আশা দৃঢ় হতে থাকে। সুমিত নিজের ভুল বুঝতে পারছে। এমন রক্ষণশীল একটা সমাজে আমার মত একটা অসহায় নিরুপায় অভিভাবকহীন মেয়েকে পরিকল্পনা করে ঠকাবার মত হীন সুমিত নিশ্চয়ই না। আমার স্ট্রাগলকে, আমার মেধাকে সে তো খুবই সম্মান করে। সে তো জানে, একটি সৎ জীবনের আশায় আমি এই প্রতিকূল সমাজের সমস্ত অশুভ নেতিবাচক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হয়তো খানিকটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিচ্ছে এখন। কতো দীর্ঘদিন আমরা এক অপরকে জানি! ওকে চিনতে এমন ভুল কিছুতেই হতে পারে না। আমি উৎসুক হয়ে জানতে চাই– কী জরুরি কথা?

– মানে... বলছিলাম, তোমার কি শরীর খারাপ?

আমার গলা বুঁজে আসে। ওর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে– হ্যাঁ গো সোনা, আমার শরীর খারাপ, খুব খারাপ। মনও খারাপ। তুমি আমাকে আগের মত আদর করে কথা বল, আমি ঠিক হয়ে যাব।

বলা হয় না। আমি রুদ্ধস্বর চুপ করে থাকি।

– কিছু বলছ না কেন। তোমার পিরিয়ড চলছে এখন?

এবার আমি প্রশ্নটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি। আমার ক্ষোভ হয়– পিরিয়ড? না, আমার এখন পিরিয়ড চলছে না।

তুমি সিওর?

হ্যাঁ, সিওর। কেন?

এদিকে তাকাও। এটা কী!

আমার সবুজ শাড়ির অর্ধেকটা বিছানায়, অর্ধেকটা বিছানার পাশে রাখা ড্রেসিং টেবিলের সীটার-এ। বিছানায় থাকা অংশটুকুতে বেশ অনেকটা রক্ত। তাজা লাল রক্ত সবুজ কাপড়ে পড়ে সামান্য কালচে দেখাচ্ছে। আমার ভেতরে শিরশির করে ওঠে। অস্বাভাবিক লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছে। কুমারীর প্রথম সঙ্গম সম্পর্কে আমার পড়াশুনা ছিল। আমার নিজের জীবনে সেই অপূর্ব ঘটনাটি ঘটেছে। শাড়িটা বিছানায় থাকায় তাতে লেগেছে রক্তের ছোপ।

বল, কী এটা।

আপনি বুঝতে পারছেন না?

কথাটা বলতে গিয়ে আবেগে আমার গলা কেঁপে ওঠে।

নতুন করে বুঝবার আর কী আছে। বলো তো শেষবার তোমার পিরিয়ড হয়েছে কবে?

আমি একটু হিসাব করে জবাব দেই– প্রায় সতের আঠারো দিন আগে।

– মিথ্যা বোলো না মালা। আমার কাছে সতী সাজবার কোনও দরকার নেই। এসব কৌশল বিয়ের রাতে স্বামীর সঙ্গে কোরো।

– কীহ্?

আমার এই আহত জিজ্ঞাসা যেন সুমিতকে আরো হিংস্র করে তোলে। হিসহিসিয়ে বলে– আজকে তোমার পিরিয়ডের কতদিন? আর এ অবস্থায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কেন?

আমি হতভম্ব হয়ে সুমিতের দিকে তাকিয়ে থাকি। তার চোখে তীব্র ঘৃণা। আমার সমস্ত স্বপ্নপ্রাসাদ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। সুমিতের প্রতিটা কথা ধারালো চাবুক হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আঘাত করতে থাকে। আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। আমি সহ্য করতে পারি না। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে– তুমি এখান থেকে যাও সুমিত। তুমি আমার জীবন থেকে একেবারে দূর হয়ে যাও। তুমি একটা মেরুদণ্ডহীন কীট। দায়িত্ব নেবার ভয়ে তুমি আমাকে এমন নোংরাভাবে আক্রমণ করছ।

বলতে চাই, কিন্তু আমার জিভ সরে না। আমার কণ্ঠ স্বরহীন। আমি অকল্পনীয় বিস্ময়ে হতবাক। সুমিত বাথরুমে গেলে আমি উঠে দ্রুত আমার বাসি ক্লেদাক্ত বেশবাস আবার শরীরে উঠাই। অরণ্যে পশুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত বনমানুষের মত বাকল জড়াই গায়ে। সবুজ বাকল। শাড়ির প্যাঁচটা এমনভাবে জড়াই যেন রক্তের দাগগুলো সহজে দেখা না যায়। হায়, আরব সভ্যতার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কুমারী নারীর পবিত্র রক্ত। পাপস্পর্শহীনতার প্রতীক। কান পাতি, বাথরুমে কলকল করে পানি পড়ার শব্দ। আমার জীবনের প্রথম পুরুষ আমাকে বলাৎকার শেষে গোসল করছে। আমি তার জীবনের কততম নারী? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি সেই বাড়ির চাবিটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে অভুক্ত স্নানহীন ধর্ষিতা এক স্বপ্নভুক নারী বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিনের পড়ন্ত দুপুরে। পুড়ন্ত দুপুরে। সেই দুপুরের আগুন সমগ্র জীবন ধরে অপমান সাথী করে জ্বলছেই। সেদিনের পর সুমিত নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছিল। আমিও।

আমার জন্মভূমিতে উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আমি তখন শিশু। কিন্তু সেদিনের লক্ষ নারীর সম্ভ্রম হারানোর ইতিহাসে পরবর্তীকালে যোগ দেয়া আমিও যে একজন সৈনিক, আমার গোপন রক্তও যে বাংলাদেশের সবুজ জমিনে মিশে লাল সূর্যটা তৈরি করেছে, কথাটা আমি আজকের আগে একবারও ভাবিনি। আমার বন্ধু শামীম, আমার গভীর গোপন গ্লানির সাক্ষী শামীম আজ কথাটা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

রহিমা আক্তার কল্পনা
কবি, কথাকার

ছোটগল্প

মুনশী আবদুল হাকিমের কোট

সালেহা চৌধুরী

দর্জি কুতুব মিয়া গম্ভীর মুখে বসে আছে। মেয়ে হালিমা এসে বাবাকে বলে– বাবা আজতো ভাড়া নিতে আসবে। আপনি কি ভাড়া দিতে পারবেন?

কুতুব মিয়া উত্তর করেন না। তার পকেট শূন্য। কিছুদিন হল তেমন কোনও কাজ পাননি। টাকা নেই। মেয়ের জন্ম থেকেই হার্টের অসুখ। ওকে ডাক্তার দেখাতে যা ছিল সব শেষ। বাড়িওয়ালা তো বলছে ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ি ছাড়তে হবে। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুতুব মিয়া বলেন– জানি। পুরুষের কাপড় টাঙিয়ে রাখার জন্য একটা পুরুষ মুর্তি 'ম্যানিকেন' আছে। অনেকদিন আগে একজনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 'ম্যানিকেনটা' দেখলে মনে হয় একজন তরুণ। যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনিও ছিলেন দর্জি। তবে অনেক বড় আর নামকরা দর্জি। তার মত নুন আনতে পানতা ফুরনো দর্জি নয়। সেই দিয়েছিল তাকে। বলেছিল– নাও জিনিসটা। আমার এক বন্ধু কোনও এক বিশেষ কাঠে 'ম্যানিকেনটা' বানিয়েছে। এখন আমার মরণের সময়।

জিনিসটা তোমারে দিলাম। যত পুরুষের কোট, সার্ট বানাবা এইটার উপর রাখতে পারবা। কুতুব মিয়া তাই করেন।

কোনও কোট বা সার্ট বানানো হলে ম্যানকেনটাকে পরান। তারপর যার নেবার, সে নেয়।

হালিমা বলে– বাবা হাসমত চাচা বলছে এইটা যদি বেচ তিনি নেবেন।

– কি বেচব?

– ওই যে যার উপর তুমি কোট সার্ট রাখো। জিনিসটারে পরাও। সেই জিনিস। একটা মডেল মানুষ। যদিও কাঠ আর উল দিয়ে বানানো কিন্তু পোশাক পরালে খুব সুন্দর লাগে দেখতে

– না এটা আমি বেচতে পারব না। এটা আমার ছেলের মত।

হালিমা বাবাকে এক কাপ চা বানিয়ে বলে– তাহলে? ভাড়া ক্যামনে দিবা।

হালিমাও চায় না জিনিসটা যাক। ওটা ওর সঙ্গীর মত। মাঝে মাঝে ম্যানিকিনটাকে পরিষ্কার করে। ওর মাথার চুল আঁচড়ায়। কালো সুতোর চুল ম্যানিকেনের তরুণের মাথায়। নতুন কোন সার্ট বা কোট ওকে যখন পরানো হয় বেশ লাগে দেখতে। এখন বাবার একটু পুরনো ফতুয়া পরে আছে। কারণ বাবা বেশ কিছুদিন ভাল কোনও অর্ডার পায়নি। ভাল অর্ডার পেলেই আবার ও সেসব পরে সুন্দর একজন হবে।

বাড়িওয়ালাকে কুতুব মিয়া এটা সেটা বলে, আরো কিছু সময় চেয়ে নিয়ে, সে যাত্রা রক্ষা পায়। বলেন বাড়িওয়ালা– এরপর যখন আসব ভাড়া দিতে না পারলে জিনিসপত্র সব ক্রোক করব। থাকার মধ্যে আছে একটা পুরনো দিনের পা সেলাই মেসিন। সিঙ্গার কোম্পানির। অনেকদিন আগের। আর একটি দুর্লভ 'ম্যানাকিন'। দুটো চকি, দুটো চেয়ার, পাতিল হাড়ি। কিছু পুরনো কাপড় চোপড়। কাপড় কাটবার কেঁচি। গজ ফিতা এমনি টুকিটাকি। বউ মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। তখন মেয়ে হালিমার বয়স ছিল দশ। এখন পনেরো। মেয়ে বড় হয়ে উঠছে। হার্টে একটু ফুটো নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ওর বিয়ের কথা ভাবছেন না দর্জি কুতুব মিয়া। নিজেও আর একটা বিয়ে করেননি। বাপ-মেয়ের সংসার। মেয়েটা মাঝে মাঝে ভাল থাকে, মাঝে মাঝে খাবি খাওয়া মাছের মত ছটফট করে। ডাক্তার বলেছেন– বিয়ে টিয়ে দিও না। ওসব জীবন ওর নয়। তোমার সঙ্গে থাক। ছেলেমেয়ে সন্তান হওয়া ওর ভাগ্যে নাই। স্বামীর আবদার সহ্য করবার মত তাজা কলিজা নয় ওর। ফুটো নিয়ে জন্মেছে। ওকে বিদায় কোরো না। করলে ওই ফুটো কলিজা নিয়ে ফিরে আসবে। তারচেয়ে বরং নিজের কাছে রেখে দাও। সংসারের কাজ, স্বামীর কাজ মেটানোর মত ওর শরীরের অবস্থা নয়।

কুতুব মিয়া তাই মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবেন না। মেয়ে আর বাবার চলে যায় দিন। যখন একটু টাকা হাতে পান হালিমার চিকিৎসা করেন। ওর জামা কেনেন। লাল ফিতে আর ক্লিপ কেনেন। ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া। যখন টাকা থাকে না? কোনওমতে দিন গুজরান। বাবা তখন এটাসেটা গল্প করে। হালিমা শোনে। বলে– বাবা গল্পগুলো তুমি যদি লেখ অনেকেই সেসব পড়বে।

– কি যে বলিস। আমি হলাম দর্জি মানুষ।

এমনিই যখন সময়– বেশ রাতে একজন গ্রাহক এসে দরজায় কড়া নাড়ে। একজন বুড়োমত মানুষ। দেখতে ঠিক সাধারণ নয়। তবে অসাধারণত্ব কোথায় বুঝতে পারেন না কুতুব মিয়া। ভদ্রলোকের হাতে একটি প্যাকেট। কতুব মিয়া তাড়াতাড়ি বসতে বলেন। কম পাওয়ারের বাল্বের আলোতে লোকটা সেই প্যাকেট টেবিলে রাখে। বলে– কোট আর প্যান্ট বানাবেন।

– ঠিক আছে।

বলে– এই নিন ডিজাইন। ঠিক যেমন নকশা আঁকা আছে তেমন বানাবেন। কতুব মিয়া চোখে চশমা লাগিয়ে নকশা দেখেন। বিশেষ নিয়মে কোট আর প্যান্ট বানাতে হবে।

– আমি কখনও কারো কাছ থেকে এমন নকশার কোট প্যান্ট বানানোর অর্ডার পাইনি।

– পাননি এখন পেলেন।

– আসলে আমার পছন্দেই আমি বানাই কিনা। তাই...

আর এই যে মেটেরিয়াল সেটাও কেমন যেন। ঠিক কাপড়ের মত নয়। কুতুব মিয়া নেড়ে চেড়ে মেটেরিয়াল দেখেন। এমন কিছু তিনি আগে দেখেননি। সবকিছুই কেমন রহস্যে ঘেরা।

– বানাতে পারবেন কিনা বলেন।

– পারব মনে হয়। তবে সেলাই মেসিনে এটা হবে বলে মনে হয় না। পুরোটা সেলাই করতে হবে সুঁচে। খুবই খাটনির কাজ।

– জানি। সেজন্য আপনাকে দশ হাজার টাকা মজুরি দেব।

দশ হাজার? কুতুব মিয়ার মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে। বাড়ি ভাড়া, মেয়ের জন্য ডাক্তার, ওর নতুন শালোয়ার কামিজ, ভালমন্দ খাওয়া সবকিছুই হবে এই দশ হাজার টাকায়।

– কোট আর প্যান্টটা কি আপনার? প্রশ্ন করেন কুতুব মিয়া।

– না। আমার ছেলের।

– তাহলে ছেলেকে আনেন। তার মাপ নেই।

– ও আসবে না। ওকে চমক দেব আমি। যে ডিজাইন লিখেছি সেটা ফলো করলেই এই মেটিরিয়ালে কোট আর প্যান্ট হয়ে যাবে। একটুও কাপড় বাঁচবে না। কাটতে গিয়ে যে-সব টুকরা হবে আমাকে দেবেন।

– আচ্ছা।

– কতদিন লাগবে আপনার?

– দিন পনেরো। বলেন কুতুব মিয়া।

লোকটা কি ভাবে। তারপর বলে– এগুলো হলে আপনি নিজে এসে আমাকে ডেলিভারি দেবেন। এই আমার বাড়ির ঠিকানা। কুতুব মিয়া ঠিকানা দেখেন। রেল গাড়ি প্রথমে, তারপর পায়ে হাঁটা।

– এত লোক বা দর্জি থাকতে আপনি আমাকে কাজটা দিচ্ছেন কেন? আপনার এলাকায় কি আর কোন দর্জি ছিল না?

– ছিল। কেন দিলাম সেটা বলব না। আপনি মন দিয়ে কাজ করবেন সেটা জানি। যাবার খরচ দিলাম। আর আগাম দুই হাজার টাকা। আপনি কাল থেকে কাজ শুরু করেন।

– আপনি একটু বসেন। চা পানি...।

লোকটা বলে– না। এখন আমি যাই। এই বলে দরজা খুলে লোকটা যেন অন্ধকারে হারায়। লোকটা যে সত্যি এসেছিল তার প্রমাণতো এই মেটেরিয়াল আর আগাম দুই হাজার টাকা।

হালিমা ঘুম থেকে উঠে প্রশ্ন করে– কে বাবা?

একজন খরিদ্দার। কোট আর প্যান্ট বানাতে চায়।

– ও। খুশি হয় হালিমা। – যাক একটা ভাল কাজ পাইলা।

তিনি কি চিন্তা করতে করতে বাইরে আসেন। না লোকটা নেই। চলে গেছে। অন্ধকারে কোনও মানুষের ছায়া নেই। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ভেতরে আসেন।

বলেন মেয়েকে– তোকে নতুন জামা বানিয়ে দেব রে মা। আর সেই ওষুধটা আনব যা আনতে পারছি না পয়সার অভাবে।

– আর তোমার জন্য কি কিনবা বাবা?

– আমার কিছু লাগবে না। পাশের চকি থেকে বলেন।

রাতে কি সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন কুতুব মিয়া। কে যেন বরফের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। তারপর একটা ধারাল চাকু। চাকুটা কেমন যেন বাঘের মত চোখে তাকে তাকিয়ে দেখছে। শূন্যে ঝুলছে একটা চাকু। তিনি আয়তুল কুরশি পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে ডান কাত হয়ে ঘুমান। হালিমার মা ও এমন করত। মেয়েটার ঘুমের শব্দ শোনেন। তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে যান কুতুব মিয়া। একসময় সকাল হয়।

পরদিন থেকে মন লাগিয়ে তিনি কাজ করতে গিয়ে বোঝেন মেটেরিয়ালটা সত্যিই অচেনা। কখনও মনে হয় গাছের বাকল। কখন মনে হয় সাপের ছাল। কখনও মনে হয় বাঘের চামড়া। আবার কখনও মনে হয় এটা কোনও চেনা-শোনা প্রাণির চামড়া নয়, একেবারে অজানা কোনও প্রাণির চামড়া। তবু যে ডিজাইনটা রেখে গেছেন মুনশী আবদুল হাকিম সেটা দেখে কাপড়টা ধারালো কাচিতে কাটেন। কেচিটাকে নতুন করে শান দিয়ে নিতে হয়। একটা চকচকে সোনালি আভা সেই মেটিরিয়ালে। যেন মেটিরিয়ালের অন্তরে একটা গোপন সোনালি আলো আছে কোথায়। ঠিক যখন প্রথম সূর্য ওঠে তেমনে চমৎকার শিশুরোদ। তিনি একটু অন্যমনস্ক হতেই সুঁইটা আঙুলে ঢুকে যায়। টুপ টুপ করে দুই ফোটা রক্ত পড়ে সেই মেটিরিয়ালে। তিনি ভয় পান। এখন যদি দাগ না ওঠে? তিনি তাকিয়ে ভাবছেন কি করবেন হঠাৎ দেখেন একটা সোনালি আভা এসে কাপড়টার

উপরের রক্তের দাগ টাকে এমন করে শুষে নিয়েছে ওখানে যে কখনও কোনও রক্তের দাগ ছিল তা মনে হয় না। তিনি অবাক হন। হালিমা এক মগ চা আর দুটো বিস্কুট এনেছে বাবার জন্য। ও তাকিয়ে দেখে। বড় বড় চোখে বলে– বাবা এটাতো মনে হয় যাদুর কাপড়। তিনি গম্ভীর গলায় বলেন– এসব নিয়ে কারও সঙ্গে কিছু আলোচনা করবা না হালিমা। এটা যে একটা নতুন কিছু সেটা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম।

কার সঙ্গে আলোচনা বাবা? আমার তো কোন বন্ধু নাই যে এসব নিয়ে আলাপ করব। কেবল রহিমা খালা মাঝে মাঝে আসেন।

– ওই খালাকেও বলবা না।

– না বাবা।

মেয়েদের পেটে তো কথা থাকে না। খবরদার এসব কথা–

– বাবা একবার বলছ আবার বলার দরকার নাই। আমি কারও সঙ্গে আলাপ করব না।

তিনি মন দিয়ে ডিজাইন মেনে কোটটা কাটেন। যে সব টুকরো কাপড় এইসব কাটাকাটিতে পড়েছে সেগুলো যত্ন করে তুলে একটা প্লাসটিকের ক্যারিয়ার ব্যাগে রাখেন। মুনশী আবদুল হাকিম সবগুলো টুকরো কাপড় চেয়েছেন।

রাতেও কাজ করেন। সব সেলাই নিজের হাতে করেন। এ জিনিস সেলাই মেসিন দিয়ে হবে না, সেটা প্রথমেই বুঝেছিলেন। চোখ জ্বালা করে। ছানিপড়া চোখ উপেক্ষা করে তিনি চোখে পানি দিয়ে পোশাক বানাতে থাকেন।

এই করতে করতে পনেরো দিনের মাথায় একটা কোট আর একটা প্যান্ট বানানো শেষ হয়। তিনি তাকিয়ে দেখেন। এ কোট আর প্যান্ট যার জন্য করা হয়েছে সে একজন বারো তেরো বছরের ছেলে। কিম্বা আর একটু বেশি। মুনশী আবদুল হাকিমের এই বয়সের একটা ছেলে আছে? দেখেতো মনে হয় বুড়ো। বুড়োর ছেলে? না নাতি? সে যাক, শেষ হলে আরও আট হাজার টাকা! পুরোটা শেষ হয়ে যাবার আনন্দে পিঠ টান টান করে দাঁড়ান। মেয়েকে বলেন– আগামী কাল এটা দিতে যাব। তিন স্টেশন রেলগাড়ি তারপর এক মাইল হাঁটা। আমি রাতের মধ্যেই ফিরে আসব। তুই দরজা বন্ধ করে ঘরে থাকিস। ভয় পাস না।

– না বাবা। আমি ভয় না পাওয়ার দোওয়া জানি।

তিনি মেয়েকে একটু আদর করেন। বলেন– আমার হালিমামা আমার কলিজার টুকরা, জানে কি ভাবে নিজেকে দেখেশুনে রাখতে হয়।

স্টেশন থেকে নেমে ভাবনগর যেতে তিনি একটু পথ হারিয়ে ফেলেন। শেষপর্যন্ত একটা চায়ের দোকানে ঢোকেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এটা ডেলিভারি দিয়ে রাত এগারোটার ট্রেনে তিনি ফিরে যাবেন। একটা লোক চা পান করছে। তিনি তাকে মুনশীর ঠিকানা দেখান। লোকটা বলে– ওকে আমি চিনি। ও তো প্রায় বিশ বছর হিমালয়ে কোন্ এক সাধুর চেলা হয়েছিল। তারপর ফিরে এসে বিয়ে করে। তেরো বছর আগে একটা ছেলে হয়। বউটা মারা যায়। এখন বাপ আর ছেলে। ও চায় না আমরা কেউ ওকে বিরক্ত করি। আপনমনে কি করে কে জানে। ছেলেটাকেও স্কুলে টুলে দেয়নি। ওর খবর তো বেশ কিছুদিন আমি জানি না। নিজের ছেলেটাকে কখনও বাইরে বের হতে দেয় না। তবে সেটা ওর ব্যাপার।

চা আলা যোগ দেয়। বলে– মাঝে মাঝে দেখা যায় বাজারে। নিজের মনে বাজার করে বাড়িতে চলে যায়। বড়ই অদ্ভুত একজন। দু'একজন আলাপ করতে চেয়েছিল, বোধহয় সাধু-সন্ন্যাসীর গল্প শুনতে চেয়েছিল। হিমালয়ে বিশ বছর কি করল লোকটা। সকলে বলে, ও নানারকম অসুখ সারানোর ওষুধ জানে। কিন্তু সে কথা ওকে কে প্রশ্ন করবে? আর প্রশ্ন করলেই ও উত্তর দেবে নাকি? ও তো বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকেও এমন করে মানুষ করছে। বাবার কথামত বা ইচ্ছেমত ছেলেটার জীবন চলছে। বোধকরি নিজে যে-সব জানে সব ছেলেটাকে শেখাবে। তাই স্কুলে দেয়নি। ওরা দুজন মিলে মুনশীর বাড়ি যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দেয়। কুতুব মিয়া বুঝতে পারেন একটা ভুল বাঁক নেওয়ার জন্য পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বড় ব্যাগে কোট আর প্যান্ট। কুতুব মিয়া বলেন– না পেলে চলে যাব। বাড়িতে ছোট একটা মেয়ে রেখে এসেছি। বলেন না কি দিতে এসেছেন। বলেন কেবল– দেখা হলে ভাল। না হলে অসুবিধা নাই। এমন ভাব করেন লোকটাকে না দেখলে ওর কোনও ক্ষতি নাই। আর ওর সঙ্গে যে জিনিস আছে সে নিয়েও কোনও কথা বলেন না। জানেন এ কথা গোপন রাখা ভাল। এটা যে একটা বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার সে কথা তো উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা বড় মাঠের শেষ প্রান্তে বাড়িটা। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নাই। কেবল নানা সব গাছ ঘেরা একটা পুরনো বাড়ি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কুতুব মিয়া গাছ গুলো দেখেন। ফলফলারি এ ছাড়া নানা ঔষধিগাছ। বড় বড় পেয়ারা আর জামরুলের গন্ধ। আতা ফলের মত কোনও পাকা ফলের গন্ধ পান। একটা গাছে মাংসের টুকরোর মত কি যেন ঝুলে আছে। এ আবার কেমন গাছ? মনে মনে বলেন। এবং আরো সব অদ্ভুত গাছ ওঁর চোখে পড়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা বড় চাঁদ তাকে দেখছে। সেই আলোতে ঝিম ঝিম করছে গাছ, বাগান, চারপাশ। তিনি বেশ কিছুক্ষণ সেসব দেখেন। বুঝতে পারেন অনেক দুর্লভ গাছ আছে ওর বাগানে। অনেক দুর্লভ লতা-গুল্ম। একসময় দরজায় বেল টেপেন। ভেতরে টিং টিং আওয়াজ হয়। দরজায় মুনশী আবদুল হাকিম। তিনি কুতুব মিয়া ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করেন। কুতুব মিয়া বলেন– এত সব গাছপালা। বারান্দাতেও গাছ। উঠোনে গাছ। মুনশী বলেন– ওইসবই আমাদের ভবিষ্যত। খাবার এবং বাঁচবার। আমি সবকিছু লিখে যাব, এইসব গাছের কথা, লতার কথা। আরো নানা কিছু। তারপর বলেন– এনেছেন? কুতুবমিয়া ব্যাগটাকে সজোরে আঁকড়ে বলেন– আগে আমার টাকা দিন। মুনশী কেমন একটু বিব্রত। বলেন– ভেবেছিলাম কিছু টাকা পাব, পাইনি। ভেতর বাড়ির ভেতরেও নানা গাছ গাছড়া। বলেন– আমি একটা বই লিখছি। এই একটি বই মানবজাতিকে বদলে দিতে পারে। মানুষ অনেকটা ঈশ্বর হয়ে যেতে পারে।

– ওসব শুনতে চাই না। আগে টাকা। তারপর অন্যকথা। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে কিন্তু আমি টাকা না নিয়ে এ জিনিস দেব না।

– আপনার কি লেখকের জন্য কোনও সম্মান নাই?

– আছে। এবং আমার নিজের পেটের জন্যও মায়া আছে। মেয়েটা–। থাক ওসব শুনে আপনি কি করবেন। টুকরো কাপড়গুলোও এনেছি। টাকা দেন এসব দিয়ে আমি চলে যাব। আমি আলাপ করতে আসিনি। একটা অসুস্থ মেয়েকে বাড়িতে রেখে এসেছি।

হাত বাড়ান মুনশী। বলেন– আমি টাকা দেব। অনেক টাকা দেব। কেবল আপনি একটু ধৈর্য ধরেন। আমাকে একটু বিশ্বাস করেন। আমাকে একটু সময় দেন। আপনি ঠকবেন না।

পনেরো দিনের অমানুষিক পরিশ্রম। বাড়ি ভাড়া। মেয়ের ওষুধ। পেটের ক্ষুধা। দীর্ঘপথ এসে ডেলিভারি। বলেন কুতুব উদ্দিন– না দিলে আমি জিনিস নিয়ে চলে যাব।

কেমন যেন হিংস্রভাবে মুনশী তাকান। অন্ধকারে তার দুই চোখ জ্বলে ওঠে। বুড়ো নয় ভয়ানক এক তরুণের মত তিনি কুতুব উদ্দিনের উপর লাফিয়ে পড়তে চান। বলেন হিংস্রভাবে, অসহায়ভাবে– আপনি কিছুতেই ও জিনিস নিয়ে চলে যাবেন না।

হঠাৎ লাগোয়া ঘরখানাতে কিসের যেন শব্দ। তিনি তাড়াতাড়ি সে ঘরে উঁকি দেন। একটা বেড়াল ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি তাকান। বিরাট বড় এক কাঠের বাক্স বরফে ভর্তি। তার ভেতরে একজন তেরো বছরের ছেলে শুয়ে আছে। মনে হয় মৃত। কুতুব উদ্দিন আঁতকে ওঠেন। এই সেই স্বপ্নের ছেলে। তিনি বলেন– আপনি তো একটা খুনী। নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে এইভাবে বরফে রেখে দিয়েছেন। আগে জানলে...

আমি খুনী না। মুনশী আবদুল হাকিম গম্ভীর গলায় জানান। ও মারা গেছে হঠাৎ হার্ট বন্ধ হয়ে। যে ছেলেকে আমি আমার সব বিদ্যা-বুদ্ধি দেব বলে ঠিক করেছি সে মারা গেছে। আমার একমাত্র ছেলে। আমার উত্তরসূরী। যে আমার সব কিছু প্রচার করবে, যে আমার সব কিছু একদিন জানবে। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি। আপনাকে বললাম তো আমি একজন বিশেষ মানুষ। বইটা আগে লেখা হোক। তবে আমার ছেলে অবশ্যই আমার রেখে যাওয়া কাজগুলো করবে। আমি যেসব দিয়ে অনেক ভেবেছি। অনেক গবেষণা করেছি।

মিথ্যাবাদী। ছেলেটাকে মেরে বরফে রেখে দিয়েছেন। তারপর বলছেন ও সব করবে? পাগলতো আপনি। ঘোর উন্মাদ। কবর দেননি কেন? ও ধরা পড়বার ভয়?

– না না ওকে কবর দিতে চাই না। ও আমার ছেলে। আমার ভবিষ্যৎ,

আমার স্বপ্ন।

আপনি শুধু খুনী নন মিথ্যাবাদী। ঘোর উন্মাদ! তাইতো বলি এত লোক থাকতে আপনি আমাকে খুঁজে বের করে এসব বানাতে দিয়ে এলেন কেন। ভাবছেন আমি চুপচাপ কিছু না বলে পোশাকটা দিয়ে চলে যাব? একটা গরীব দর্জি! আপনার ধমকে ভয় পাব। সেটা হবে না। মৃত ছেলের জন্য এইসব? ঠাট্টার তো একটা সীমা আছে। আপনি একটা মহা স্যাডিস্ট। আমি এখনি গিয়ে পুলিসকে বলব আপনি কি কাণ্ড করেছেন। নিজের এলাকা বাদ দিয়ে আমাকে কেন দিয়েছেন এবার সেটা বুঝতে পারছি।

– না আপনি যাবেন না। আপনি কোট-প্যান্ট দেবেন তারপর যাবেন। মুনশী আবদুল হাকিম একটা ছুরি হাতে। দপ দপ করছে তার দুই চোখ। আপনি যদি এটা না দিয়ে যেতে চান প্রাণে বাঁচবেন না।

পাগল নাকি। আপনি কি পাগল! আপনার মৃত ছেলে এসব পরবে?

আপনি যা জানেন না সেসব নিয়ে কথা বলবেন না। মুনশী চাকু হাতে কাছে এগিয়ে আসছেন। একটা হারিকেন জ্বলছে। বাতি নেই। অবাক দরজার ওই বেলটা তাহলে বিদ্যুতে চলে না।

মুনশী কেবল ঝাঁপিয়ে পড়তে চান বাঘের মত গর্জন করে, কেবল গর্জন বাঘের মত নয়, তাকে দেখতেও লাগছে বাঘের মত। দপ দপ করছে চোখ। তিনি যেন আগের চেয়ে লম্বা আর শক্তিশালী হয়ে গেছেন। মাথার চুলগুলো মাথার উপরে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি কেবল ঝাঁপিয়ে পড়বেন তখনি কোটের পকেট থেকে একটা ধারালো চাকুতে মুনশীর কলিজা বিদীর্ণ করেন দর্জি কুতুব মিয়া। কেঁচিটা এনেছিলেন যদি এখানে কিছু কাটাকাটি করতে হয়। বরফের ভেতরে সেই তেরো বছরের ছেলে কি একবার নড়ে ওঠে? তারপর সব শেষ। বেড়ালটা বাড়ি থেকে চলে গেছে। একটা অচেনা পাখি খাঁচায় পাখায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। কয়েকটা গিনিপিগ একটা খাঁচায়। হারিকেন এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মাটিতে পড়েছে। কেরোসিন গড়িয়ে পড়ছে। কুতুব মিয়া পাগলের মত বাড়ি থেকে বের হন। খানিকপর বাড়িটা পুড়ে যাবে। পুড়ে যাবে মুনশী আবদুল হাকিম আর তার মরা ছেলে। টেবিলে যে বইটা দেখেছিলেন সেটাও পুড়বে। কুতুব মিয়া জানেন না এই পৃথিবীর একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই এইসবের সঙ্গে ছাই হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনও মানুষ এমন একটা বইয়ের কথা জানবে না। বিশ বছর ধরে যা জেনেছিলেন মুনশী আবদুল হাকিম। তাঁর সব জানা, সারা জীবনের যত জানা যত জ্ঞান সব তিনি এই বিশাল গ্রন্থে ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন। কেউ জানবে না কি শেষ হয়ে গেল এই মুহূর্তে।

কোনওমতে মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কুতুব মিয়া স্টেশনে আসেন। পিছু ফিরে দেখতে পান বাড়িটা পুড়ছে। আগুনে জ্বলছে একটা বাড়ি। একজন জীবিত আর মৃত মানুষ। আর একটি গ্রন্থ। তিনি ছুটে চলে আসেন স্টেশনে। ট্রেন এসে যায়। তিনি লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠেন। পকেটে রক্তাক্ত চাকু। আর সারা শরীরে জবজবে ঘাম।

মেয়েটা জেগে ছিল। বলে– বাবা টাকা পেলে?

তিনি কিছু বলেন না। এরপর ব্যাগ থেকে কোট আর প্যান্ট বের করে ম্যানিকেনটাকে পরান। এগুলো ওর গায়েই থাক। যদি কেউ কিনতে চায় দেবেন। সোনালি আলোর দ্যুতি সেখানে। ঝকঝক করছে সেই অদ্ভুত মেটিরিয়ালের পোশাক। ম্যানিকেনের কালো চুল আর কালো চোখ তাকে দেখছে।

– ওনাকে দিলে না এসব? মেয়ে প্রশ্ন করে।

– না। এই বলে তিনি বিছানা খোঁজেন। মেয়ে বুঝতে পারে কোথাও একটা বড় গোলমাল হয়েছে।

ক্লান্ত কুতুব মিয়া বিছানায় যান। সারাদিন না খাওয়া। শূন্য পকেট। ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আচ্ছন্ন হয়ে।

সাতদিন পরে একটা কাজের অর্ডার নিয়ে বাড়ি আসছেন। রাত প্রায় বারোটা। বড় কাজ। মনটা প্রসন্ন। ঘরের কাছে আসতেই মেয়ের খিল খিল হাসি শুনতে পান। মেয়েটা কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। বলছে– বাবা যখন থাকবে না এইভাবে আমরা গল্প করব। কেমন? অন্যপক্ষের গলা শোনা যায় না। বলে হালিমা– বাবকে বলার দরকার নেই। এই পৃথিবীতে থাকব কেবল তুমি আর আমি। তুমি আর আমি এই বিশ্বের সেরা বন্ধু। বন্ধু আরো কাছে আসো। এই পৃথিবীতে আমার আর কাউকে দরকার নেই। মেয়েটা এমন সব কথা কবে শিখল? ডাক্তার যা বলেছিলেন সেই কথা ভেবে তিনি আতংকিত। দরজা খুলে মেয়েটাকে বকতে যাবেন এমন কাজে চমকে তাকান– হেঁটে হেঁটে কাঠের ম্যানিকেন মেয়েটার বিছানার কাছে চলে এসেছে। মেয়েটা অবশ্যই ওই ভারী ম্যানিকেনটাকে এখানে আনতে পারে না। জীবন্ত মানুষের মত তাকিয়ে আছে সেই ম্যানাকিন কতুব মিয়ার দিকে। তার গায়ে সেই কোট আর প্যান্ট। সোনালি আলো ঠিকরে পড়ছে সেই কোট থেকে। আর সেই আলোতে ঘরটাও কেমন উজ্জ্বল মনে হয়। কাঠের ম্যানিকেনে প্রাণ এসেছে। এই পোশাকে? তিনি বিড় বিড় করেন? এই পোশাকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন আর এক জগত থেকে। আর সেইসব কথা লিখে রেখেছিলেন বইটাতে, যা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। কোন গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছিলেন এই মুনশী আবদুল হাকিম কে জানে? হঠাৎ চমকে তাকান হাত বাড়ায় ম্যানিকেন কুতুব মিয়াকে শেষ করে দেবে বলে। তিনি নড়তে পারছেন না। সম্মোহিত। জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখছে সেই বিশেষ ম্যানিকেন।

মেয়েটা বাবাকে রক্ষা করবে বলে এগিয়ে আসে না। মুনশী আবদুল হাকিমের নকশায় আর তারি দেওয়া বিশেষ ছাল বাকলে বানানো পোশাকে সেই প্রাণ পাওয়া ম্যানিকেন মনে হয় আর কাউকে সহ্য করবে না।

সালেহা চৌধুরী প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ ফেব্রুয়ারি

লীলা মজুমদার

০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ ❖ পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ❖ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ❖ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ ❖ কবি ও রাজনীতিক সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ ❖ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ ❖ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ❖ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ❖ কথাকার লীলা মজুমদারের জন্ম
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ ❖ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের জন্ম

ভ্রমণ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাতদিন

ড. বেলারাণী সরকার

আন্দামান দ্বীপের নাম শুনলেই অধিকাংশ মানুষ মনে করে মানুষের শাস্তির ভয়ংকর এক দ্বীপ। এ দ্বীপে যাওয়া অনেক কঠিন– এখানে আদিম মানুষ বাস করে; দ্বীপে গেলে বিপদ হতে পারে; ভারত সরকারের অনুমতি ও আলাদা ভিসা লাগে। না, আলাদা কোনও ভিসা বা অনুমতি লাগে না। যারা একবার আন্দামান গিয়েছেন, সবাই বলেছেন খুব সুন্দর। উদিত সূর্যের দেশ আন্দামান; কারও মতে কালাপানির দেশ আন্দামান; বিভীষিকাময় আন্দামান; ল্যান্ড অফ মেরিগোল্ড, অভিমানী আন্দামান। পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষ দ্বীপ দু'টির নাম দিয়েছিলেন যথাক্রমে শহীদ দ্বীপপুঞ্জ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। বন্ধুবান্ধবদের অনেককে আমাদের সঙ্গে আন্দামান যাবার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু কাউকে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে না পেয়ে অনেকদিনের ইচ্ছা পূরণের জন্য ভয়ে ভয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আন্দামানের সৌন্দর্য উপভোগে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কলকাতা থেকে আন্দামানে দু'ভাবে যাওয়া যায়– জাহাজে ও প্লেনে। সমুদ্রপথে জাহাজে যেতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বিমানে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যেতে সময় লাগে ২.২৫ ঘণ্টা। কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার প্লেনে আসা-যাওয়ার টিকেট ও আন্দামানে সাতদিনের বিভিন্ন দ্বীপ দর্শনের ভ্রমণ প্যাকেজ টুরিস্ট এজেন্সি থেকে অগ্রিম কেটে নিয়েছিলাম।

সেলুলার জেলের অভ্যন্তরভাগ

জেলে কয়েদীদের দিয়ে কায়িক শ্রম

ঢাকা থেকে মৈত্রী ট্রেনে এপার বাংলা ওপার বাংলার গ্রাম, শহর, ফসলের মাঠ, নদী, খাল-বিলের বৈচিত্র্যময় চোখজুড়ানো ও মনভোলানো দৃশ্য দেখতে দেখতে কলকাতা গিয়ে পৌঁছলাম। ঢাকা থেকে আন্দামান যাবার সরাসরি কোনও ফ্লাইট নেই। প্রতিদিন কলকাতা থেকে সকালে ৩-৪টি ফ্লাইট নিয়মিত আন্দামানে যায় এবং বেলা ১টার মধ্যে ফেরত আসে। পোর্টব্লেয়ার থেকে বিকেলে কোথাও কোনও ফ্লাইট নেই। কলকাতা থেকে ভোর ৫.৪৫টায় ফ্লাইটে টিকেট কাটা ছিল। সেদিন ভোরে কলকাতার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশায় রাস্তাঘাট ছিল আচ্ছন্ন। আমাদের ভয় হচ্ছিল, প্লেন যথাসময়ে যাবে তো? কিন্তু যথাসময়ে কলকাতা থেকে ফ্লাইট ছেড়ে ৮.৩০টায় পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছয়। বিমান অবতরণের আগে পরিষ্কার আকাশ, সমুদ্রের নীল জল ও পাহাড়ের সবুজ বৃক্ষরাজির অপূর্ব দৃশ্য দেখে মন ভরে গিয়েছিল। বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশন করার সময় শীতের গরম কাপড় খুলে ফেলতে হয়েছিল। ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের দেশ আন্দামানে তখন শীতের তীব্রতা নেই। আন্দামান ও নিকোবর বেড়ানোর মৌসুম মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-মে হলেও, মধ্য-নভেম্বর থেকে মার্চ মাস ভ্রমণের উত্তম সময়। এ সময় বৃষ্টিপাত কম হয়।

ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে গেটে গিয়ে দেখি ড্রাইভার আমাদের নাম লেখা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের হোটেলে নিয়ে যাওয়ার পথে আজ কোথায় কোথায় কখন দর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তা হিন্দিতে বলেছিল। ভাল বুঝতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল ভাষাগত সমস্যা হবে। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর ড্রাইভার বলে, স্যার আমি বাংলা জানি, তাতে মনের জোর অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আজকের ভ্রমণসূচিতে ছিল বিখ্যাত সেলুলার জেল দর্শন এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখা। হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার বলেছিল, ঠিক দশটায় রেডি থাকবেন, আপনাদের সেলুলার জেল দেখাতে নিয়ে যাব।

সেলুলার জেলের অভিজ্ঞতা

আন্দামান ও নিকোবর দু'টি পৃথক দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপসাগরে ১৩০ কিমি দীর্ঘ ১০ ডিগ্রি চ্যানেলের দুই দিকে দুই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। দুই দ্বীপপুঞ্জের সদর দপ্তর হচ্ছে দক্ষিণ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার। সেলুলার জেল পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত– শহরের উত্তর-পূর্বে। সেলুলার জেল গেটটি অনেক কারুকার্যপূর্ণ এবং দেখতে খুব সুন্দর। ড্রাইভার সেলুলার জেলে প্রবেশের টিকেট আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। শহিদদের স্মরণে প্রবেশপথের ভিতরে কারুকার্যপূর্ণ দু'টি অনির্বাণ শিখা তৈরি করা হয়েছে। তিনতলা দু'টি জানালাবিহীন সেল দালান দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে দেখলাম ব্রিটিশরা কয়েদীদের যে চেয়ারে বসে বিচার ও শাস্তি প্রদান করত, সেই চেয়ারটি। কয়েদীদের চাবুক দিয়ে অমানবিকভাবে মারার পর রক্তক্ষরণ ও দাগ দেখে মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। এরপর কয়েদীদের দিয়ে নানারকম কাজ করানো হত যেমন সরিষার ঘানি টানানো, লোহা পেটানো, নারকেল ভাঙা ইত্যাদি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের রশিতে ঝুলিয়ে ফাঁসি কার্যকর করা হত, সে ঘরটি দেখে আজও মন শিউরে ওঠে। ছোট জনালাবিহীন কক্ষে ১০-২০জন কয়েদীকে রাখা হত। ত্রিতল দালানের বাইরে সংস্কারের কাজ চলছে। সেলুলার জেলের সেন্ট্রাল টাওয়ারে উঠে চারপাশের বহু দূর পর্যন্ত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশের অত্যাচারে নিহত ৩৩৬ জন শহীদের নাম টাওয়ারের দ্বিতলের দেওয়ালে ১৩টি ফলকে নামাঙ্কিত রয়েছে। তিন ঘণ্টা সেলুলার জেলে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের নানান ঘটনার বাস্তব চিত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারপর হোটেলে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য ফেরত গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় আবার গেলাম সেলুলার জেলের ভিতর লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ৪টি শো দেখানো হয়। প্রথম শো ৬-৭টা। আমাদের জন্য ৮-৯টার শোতে টিকেটের ব্যবস্থা করা ছিল। প্রতি শোতে ৫০০ জন একসঙ্গে দেখতে পারেন। ব্রিটিশদের নানা অত্যাচারের বিভীষিকাময় করুণ চিত্র, কয়েদিদের আর্তনাদ, বিদ্রোহের চিত্র নিখুঁতভাবে লাইট এন্ড সাউন্ডের মাধ্যমে দেখেছিলাম যা দেখে দর্শকরা চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। আমাদের মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। আমরা বিনম্রচিত্তে সেদিন শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম।

রোজ ও নর্থ বে আইল্যান্ড

দ্বিতীয় দিন রোজ ও নর্থ বে আইল্যান্ড (কোরাল আইল্যান্ড) দেখতে গিয়েছিলাম। এ দু'টি আইল্যান্ড পোর্টব্লেয়ারের অতি কাছে। রোজ আইল্যাড দেখানোর উদ্দেশ্যে ড্রাইভার হোটেল থেকে সকাল ন'টায় ২ কিমি দূরে ফেরিঘাটে নিয়ে গিয়েছিল। ফেরিঘাটের দৃশ্য অতি চমৎকার। সাগরের পাড়ের অনেক স্থানে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে বসে পোর্টব্লেয়ারের জনগণ ও দেশি-বিদেশী পর্যটকরা প্রতিদিন সাগরের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে থাকেন। স্পিডবোটে ২০ জনকে রোজ আইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল। রোজ আইল্যান্ড যেতে ৩০ মিনিট সময় লাগে। রোজ আইল্যান্ড ঘুরে দেখার জন্য আমাদের ২ ঘণ্টা সময় বাঁধা ছিল। রোজ আইল্যান্ড ভ্রমণসঙ্গীদলে পশ্চিমবঙ্গের দু'টি পরিবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আমরা বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে গিয়েছি শুনে তাঁরা অবাক হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এতদূর থেকে আমরা বেড়াতে গিয়েছি। তাঁরা আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছিলেন। একসঙ্গে সমস্ত রোজ আইল্যান্ড এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। তাঁরা ইতোপূর্বে কোন্ কোন্ আইল্যান্ড দেখেছেন, তার ভালমন্দ আমাদের কাছে বলেছিলেন, যা আমাদের পরে কাজে লেগেছিল। রোজ আইল্যান্ড ছোট্ট একটি দ্বীপ। চারিপাশে নীল সাগরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। দ্বীপটি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশরা সুন্দর দালানকোঠা তৈরি করে বাগানবাড়ি বানিয়ে এ দ্বীপ থেকে প্রশাসন পরিচালনা করত। ব্রিটিশরা চলে যাবার পর বহু বছর এসবের ব্যবহার না হওয়ায় দালানকোঠায় বট ও অন্যান্য গাছ বেড়ে উঠেছে। আইল্যান্ডের কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনি অবস্থান করছে। একটি পুকুরে শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। কিছু দালানকোঠা সংস্কার করে অফিসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইল্যান্ডে পর্যটকদের দেখার জন্য ঘোড়ার গাড়ির সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আমরাও ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। রোজ আইল্যান্ডের নানারকমের বৃক্ষরাজি যেমন তাল, নারকেল, সুপারি, ফলদ ও বনজবৃক্ষ এবং চারপাশের সাগরের নীল জলের ছোটবড় ঢেউয়ের মাতামাতি দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। রোজ আইল্যান্ড থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে স্পিডবোটে করে অল্প দূরে কোরাল দ্বীপে গিয়েছিলাম। এ দ্বীপের জলের নীচে নানারঙের সুন্দর সুন্দর কোরাল রয়েছে, এজন্য এর নাম কোরাল দ্বীপ। অনেক দূর পর্যন্ত বোটের মধ্যে রাখা বড় ম্যাগনিফাইং কাচের সাহায্যে নানারঙের ছোটবড় কোরাল দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। পর্যটকরা নীল জলে স্নান ও সাঁতার কাটে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য ফাঁসির রশি

নানা দ্বীপে যাওয়ার জন্য বোট

রোজ আইল্যান্ডের পুরনো দালানকোটা

পাশে পাহাড়ে নারকেল ও অন্যান্য বৃক্ষের দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। বিকেলে বীচ থেকে সাগরের নীল জলের ছোটবড় ঢেউয়ের উপর দিয়ে পোর্টব্লেয়ার জেটি পর্যন্ত ভ্রমণ খুব আনন্দদায়ক হয়েছিল।

হ্যাভলক দ্বীপের অভিজ্ঞতা

সকালে হ্যাভলক দ্বীপে যাবার জন্য ডাইরেক্টরেট অফ শিপিং সার্ভিসের ফেরিলঞ্চ রঙ্গত ফিনিক্স জেটিতে নিয়ে গিয়েছিল। বিমানযাত্রীদের বিমানে ওঠার মত চেকিং করে জেটি থেকে প্রতিদিন জাহাজ সকাল ৬.৩০টায় ছেড়ে হ্যাভলক যায়। সৌন্দর্যে পোর্টব্লেয়ারের পরেই সূর্যোদয়ের দ্বীপ হ্যাভলকের স্থান। পোর্টব্লেয়ারের উত্তর-পূর্বে জলপথে দূরত্ব ৫০ কিমি। পোর্টব্লেয়ারের জেটির তিনদিকে সাগর ও দূরে পাহাড়ের দৃশ্য অতি চমৎকার। জেটি থেকে জাহাজ নীল জলের বিশাল সাগরের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছোটবড় ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে ছুটে চলায় ভ্রমণ খুব আনন্দদায়ক হয়েছিল। চলার পথে দুইপাশে সবুজ পাহাড় ও নীল জলে চোখজুড়ানো ঢেউয়ের নৃত্য দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। রঙবেরঙের পাখপাখালির ওড়াউড়ি এবং ডলফিনের ছুটাছুটির দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চলার পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য এতই সুন্দর যে, চোখ ফেরানো যায় না। হ্যাভলক যেতে ২ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। হ্যাভলক জেটিতে নামার পর টুরিস্ট গাউড আমাদের এলিফ্যান্ট বীচে যাওয়ার জন্য স্পিডবোটে নিয়ে যায়। হ্যাভলক জেটির চারপাশের দৃশ্য ছবির মত সুন্দর। হ্যাভলক থেকে স্পিডবোটে যাত্রার পর একদিকে বৃক্ষরাজিতে ভরপুর সবুজ পাহাড় ও অপর দিকে বিশাল সাগরের নীল জলের ঢেউয়ের উত্তাল নৃত্য দেখতে দেখতে ৩০মিনিট পর এলিফ্যান্ট বীচে পৌছলাম। বীচের পাহাড়ের আকৃতি দেখতে অনেকটা এলিফ্যান্ট বা হাতির মত এবং বনের ভিতরে প্রচুর হাতি রয়েছে, তাই এ বীচের নাম এলিফ্যান্ট বীচ। এ বীচে ছেলে-মেয়েদের নানারকম খেলাধূলার সুব্যবস্থা আছে, যেমন রাবারের ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ানো, স্কেটিং, নৌকায় বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে জলের নীচে নানারকম কোরাল দেখার ব্যবস্থা আছে। বীচটি আকারে ছোট হলেও সবুজ গাছপালা ও নানারকম পাখি দেখে ও ডাক শুনে এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে আলাপে এলিফ্যান্ট বীচ দর্শন খুব উপভোগ্য হয়েছিল। বিকেল ৪টায় এলিফ্যান্ট বীচ থেকে হ্যাভলক শহরে ফেরত এসে জেটি থেকে ৪-৫ কিমি দূরে শহরের হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। হ্যাভলক দ্বীপের সবুজ পাহাড় ও শ্বেতশুভ্র বালুকাবেলা ১০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত। হোটেল থেকে সমুদ্রের গর্জন ও সাগরের অফুরন্ত নীল জলে চাঁদের আলো পড়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কালাপাথর ও রাধানগর বীচের অভিজ্ঞতা

পরের দিনের ভ্রমণসূচিতে ছিল হ্যাভলকের কালাপাথর বীচ ও রাধানগর বীচের সৌন্দর্য উপভোগ। সকালে হোটেল থেকে কালাপাথর বীচে যেতে ১ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। শহর থেকে কালাপাথর যাবার রাস্তার একপাশে নীল জলের বিশাল সাগর অপর পাশে সবুজ বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা কালাপাথর বীচে গিয়েছে। রাস্তার দুই পাশের দৃশ্যে নয়ন জুড়িয়ে গিয়েছিল, এ বীচের সৌন্দর্য দেখা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এখানে বড় বড় কালো পাথর রয়েছে, যাতে ছোট বড় ঢেউ প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ছে। দেশি-বিদেশী পর্যটকরা বীচে বসে সোনালি ডাবের মিষ্টি জলের স্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। আমরাও সোনালি ডাবের জল পান করতে করতে নীল জলের সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম। এখানে কালো মিষ্টি আখ পাওয়া যায়। হ্যাভলকে স্থানীয়ভাবে তৈরি সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। কালাপাথর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রাধানগর বীচে গিয়েছিলাম।

অর্ধ-বৃত্তাকার সৈকতবেলা, পাহাড় আর অরণ্যঘেরা অনুপম রাধানগর বীচ। এ বীচটি অনেক বড় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই দেখা যায়। সকল বয়সের মানুষ সাগর জলে স্নান ও সাঁতার কেটে আনন্দ করে। আমরাও স্নান করেছিলাম। প্রতিদিন বহু দেশি-বিদেশী পর্যটকের এ বীচে আগমন ঘটে। আমরা অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্তের দৃশ্য নয়ন ভরে দেখেছিলাম। রাধানগর বীচের রাস্তা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে হ্যাভলক শহরে গিয়েছে। পথে নানারকম পাখির মধুর ডাক শুনতে পাওয়া যায়। রাতে হ্যাভলক শহরে সমুদ্রের ধারে হোটেলে ছিলাম। পরের দিন নীল দ্বীপে যাবার বিষয়ে টুরিস্ট গাইড নানা নির্দেশনা দিয়েছিল। হ্যাভলক বাঙালিপ্রধান দ্বীপ। সবাই বাংলায় কথা বলে। ইংরেজি ও হিন্দিও ভাল বলতে পারে। এ দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। পলিথিনমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সবুজ বৃক্ষরাজি ফুলে-ফলে ভরপুর সুন্দর একটি দ্বীপ রাধানগর। এখানে বেকার সমস্যা নেই।

নীল দ্বীপের অভিজ্ঞতা

সকালে আমাদের হোটেল থেকে গাড়িতে করে হ্যাভলকের জেটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হ্যাভলক জেটির চারিদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। হ্যাভলক থেকে জাহাজে বিশাল সাগরের উপর দিয়ে নীল দ্বীপে যেতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। বিশাল সাগরের নীল জলের ঢেউয়ের খেলা, দুই পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমাদের মন ভরে গিয়েছিল। বাঙালিপ্রধান নীল দ্বীপটি আকারে ছোট হলেও (১৮.৯০ বর্গকিমি) সৌন্দর্যে হ্যাভলকের অনুরূপ। হোটেলে ব্যাগ রেখে আমাদের লংম্যান বীচের সৌন্দর্য দেখার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। এ বীচটি সমতল– গভীরতা ও ঢেউ কম থাকায় পর্যটকরা অনেক সময় জলে নেমে আনন্দ করে থাকেন। আমরাও অনেক দূর পর্যন্ত জলের মধ্য দিয়ে গিয়ে স্নান ও সাঁতার কেটে মজা করেছিলাম। স্পিডবোটে সাগরে বেড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে আমাদের প্রাকৃতিক পাথরের ব্রিজ দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ বীচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বীচের পাড়ের পাথর রাতে পানিতে ডুবে যায়, সকালে জল নেমে যায়। পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বীচের দৃশ্য দেখতে হয়। পাথরের উপর দিয়ে হাঁটার আনন্দ অনেক। প্রাকৃতিক পাথরের ঝুলন্ত ব্রিজ দেখার আনন্দ ভুলবার নয়। এরকম প্রাকৃতিক পাথরের ব্রিজ কোথাও দেখিনি। পাথরের মাঝে জলে নানারকমের ছোটছোট মাছ দেখা যায়। সবুজ পাহাড়ের পাশে নীল জলের সাগর এবং দূরে পাহাড়ের দৃশ্য নয়নাভিরাম। এ বীচের সঙ্গে অন্য বীচের তুলনা হয় না।

এখান থেকে আমরা ভরতপুর বীচে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য গিয়েছিলাম। সাগরে জলের উপর আকাশ থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখার সময় বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক উপস্থিত হয়েছিলেন। বীচ থেকে ফিরে নীল দ্বীপের হোটেলে রাত্রিযাপন করি। পরদিন পোর্টব্লেয়ার ফেরার পালা। দ্বীপটির চারিদিকে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার আনন্দ অপার্থিব।

নীল দ্বীপে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি পাথরের ব্রিজ

গ্রামের দৃশ্য

মাটির ভলকানো

পোর্টব্লেয়ার ও করবিনস কোভ বীচ

সকাল ১১টায় নীল দ্বীপের জেটি থেকে জাহাজে নীল জলের সাগরের অপূর্ব চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেলা ১টার সময় পোর্টব্লেয়ার জেটিতে পৌঁছি। নীল দ্বীপ থেকে পোর্টব্লেয়ার আসার ভ্রমণপথে সাগরের নীল জলের উত্তাল ঢেউয়ের উপর সূর্যের আলো পড়ার দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। উড়ন্ত পাখি ও পাহাড়ের দৃশ্য শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিকালে করবিনস কোভ বীচে গিয়েছিলাম। এ বীচটি পোর্টব্লেয়ার শহর থেকে ৭-৮ কিমি দূরে ছোট একটি বীচ। এখানে স্পিডবোটে সাগরে বেড়ানো, স্কেটিং করা যায়। পর্যটকরা বিকেলবেলায় ভ্রমণ উপভোগ করে থাকেন। করবিনস কোভ বীচ থেকে পোর্টপ্লেয়ার সড়কের একপাশে পাহাড়ে সুন্দর ঘরবাড়ি ও ফুলের বাগান এবং পাশে নীল জলের বিশাল সাগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতিশয় চমৎকার। পরদিন বারাটাং দ্বীপে যাবার জন্য রাত ৩টায় পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজের ফটোকপিসহ তৈরি থাকার জন্য গাইড বলে গিয়েছিল। এত রাতে যেতে হবে ভেবে ভয় পেয়েছিলাম, যদিও হোটেলের ম্যানেজার বলেছিলেন বিপদের কোনও আশংকা নেই।

বারাটাং দ্বীপের সৌন্দর্য ও বন-মানুষ

রাত তিনটায় আমদের নিয়ে বারাটাং দ্বীপের উদ্দেশ্যে গাড়ি যাত্রা করেছিল। গাড়িতে টুরিস্ট গাইড ছিল। আমরা দু'জনে মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম। কিছু দূর যাবার পর রাস্তায় পর্যটকদের আরও গাড়ি চলতে দেখে ভয় কেটে গিয়েছিল। পুলিশ চেক পয়েন্টে সিরিয়াল দিতে হয়, যারা আগে লাইন দিতে পারবে, তারা আগে বনের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে। সামনে-পিছনে পুলিশ প্রহরায় নির্দিষ্টসংখ্যক গাড়ি ২৫ কিমি গভীর বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যায়। ভোর ছ'টায় পুলিশ চেকের পর একসঙ্গে পর্যটকদের সব গাড়ি যাত্রা করেছিল। সবাই গভীর আগ্রহভরে বন-মানুষ খুঁজতে খুঁজতে ২৫ কিমি রাস্তা পাড়ি দিয়ে ফেরিঘাটে পৌঁছেছিল, কিন্তু পথে কোথাও বন-মানুষের দেখা মেলেনি। গাইড বলেছিল ফেরার পথে বন-মানুষদের দেখা মিলতে পারে। কারণ সকালে তারা গভীর বনে শিকারে যায়, তাই রাস্তার পাশে কম আসে। বনের নানারকম ছোটবড় সবুজ গাছ ও ফুল দেখে, পাখির ডাক শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। ফেরি পার হতে একঘণ্টা সময় লেগেছিল। নদীর দুই ধারে ফুলশোভিত বৃক্ষের দৃশ্য অতি চমৎকার। একঘণ্টা ফেরির উপর থেকে নদীর নীল জলের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে অপর প্রান্তের ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল। ফেরিঘাট হতে স্পিড বোটে ম্যানগ্রোভ বনের পাশ দিয়ে একঘণ্টা চলার পর বনের একটি স্পটে নামিয়ে দেয়। নদী থেকে বনের ভিতর দিয়ে দুই কিমি কাঠের পুলের সুন্দর রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে খুব ভাল লেগেছিল। চলার পথে দুই ধারে ম্যানগ্রোভ গাছের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে মন ভরে গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ গাছের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিকড় ও ডালপালা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। বন পাড়ি দিয়ে আরও দুই কিমি রাস্তা গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে লাইমস্টোন গুহায় গিয়েছিলাম।

লাইমস্টোন গুহার সৌন্দর্য

গাইড টর্চের আলো জ্বালিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করে। আমরা তার পিছনে পিছনে ৩কিমি গুহার ভিতর দিয়ে নানারঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হাতি, গণেশের ছবি দেখি, যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কিংবা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরকম প্রাকৃতিক লাইমস্টোনের গুহা দেখার সৌভাগ্য আমাদের ইতোপূর্বে হয়নি। গাইড গুহার ভিতরের প্রতিটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি ছবির সৃষ্টিরহস্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করে। লাইমস্টোন গুহার সৌন্দর্য আমাদের খুবই আকৃষ্ট করে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বনের ভিতরের নানারকম গাছগাছালি-পাখপাখালি দেখতে দেখতে ও তাদের ডাক শুনতে শুনতে নদীর পাড়ে এসে স্পিডবোটে উঠলাম। তারপর নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ফেরিঘাটে পৌঁছলাম। ফেরিঘাট থেকে বাসে ১০কিমি দূরে মাটির ভলকানো দেখতে যাই।

মাটির ভলকানো

পাহাড়ী উঁচু ভূমিতে অনেকটা স্থান জুড়ে ১৬টি স্থানে প্রতিনিয়ত কাদামাটির বুদবুদ উঠছে। জায়গাটি ঘেরাও দেওয়া আছে। চারিদিক গাছপালায় ভরপুর। মাটির ভলকানো দেখে ফেরি পার হয়ে পোর্টব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম।

বন-মানুষ দেখা

মনে বড় আশা ছিল বন-মানুষ দেখার। বনের ভিতর দিয়ে ২৫ কিমি চলার পথে বন-মানুষের একটি বাড়ি গাইড দেখিয়েছিল। স্থানীয়রা জানালেন, বন-মানুষরা এখন আর যখন-তখন সড়কের পাশে আসে না, মাঝে মাঝে আসে। যাদের ভাগ্য ভাল, তারা দেখা পায়। রাস্তার দুই পাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা, ফসলের মাঠ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ পোর্টব্লেয়ার ফিরে এসেছিলাম। পরদিন কলকাতা ফেরার পালা। আন্দামান-কলকাতা-ঢাকা ভ্রমণের অষ্টমদিনে আন্দামান থেকে সকাল ১১টার ফ্লাইটে কলকাতা ফিরে পরদিন কলকাতা থেকে মৈত্রী ট্রেনে ঢাকায় ফেরত এসেছিলাম।

উপসংহার

আন্দামান দ্বীপসমূহে কোথাও পলিথিনের ব্যবহার নেই। সমুদ্র সৈকত, শহর, রাস্তাঘাট– কোথাও পলিথিন নেই। নেই যেখানে-সেখানে দোকানপাট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধূলাবালিমুক্ত সব দ্বীপ। প্রাণভরে বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিতে পেরেছিলাম। যে যাই বলুক, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রূপের তুলনা হয় না। প্রকৃতির রাণী অতি নিপুণ হাতে দক্ষ স্থপতির মত বঙ্গোপসাগরের বুকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছে পাহাড় আর অরণ্য দিয়ে আন্দামান দ্বীপকে। মৃদু-মন্দ নির্মল বাতাস, দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশের নিচে ঘোলা অথৈ বঙ্গোপসাগর এবং ভেজা রূপোলি বালুকাবেলা, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের সৌন্দর্য না দেখলে জীবনটা অপূর্ণ থেকে যেত। সাতদিন কোথা দিয়ে চলে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। সুযোগ হলে আবার যাব বন-মানুষ দেখতে।

ড. বেলারাণী সরকার
ভ্রামণিক

পাদটীকা:

লেখক বন-মানুষ বলে যাদের অভিহিত করেছেন, তারা আদতে প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠীর দেশজ মানুষ। 'জারোয়া' নামে পরিচিত এ জনগোষ্ঠীর বসতি মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামানে– সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ চারশো। – সম্পাদক

উপন্যাস

ধা রা বা হি ক

কেউ কেউ পায়

অনিন্দিতা গোস্বামী

[পূর্ব প্রকাশিত-র পর]

দশ.

খিদে। আট নম্বর টেবিলে এসে বসেছে ছেলেটি। গত একবছর ধরে ওকে দেখছি। রোগা, লম্বা, বছর উনিশ বয়স। ঘাড় নীচু করে খাচ্ছে। গবগব করে খাচ্ছে কোনও দিকে না তাকিয়ে। ওঁর টেবিলের ওপরে থরে থরে সাজানো নুডুলস্, বিরিয়ানি, বার্গার, পিৎসা, স্যান্ডুইচ। সব খাবে ও একা। আগে এত খাবার খেত না ছেলেটি। এত রোগাও ছিল না। ও খাবার খাচ্ছে, নাকি খাবার ওকে খাচ্ছে। কে আগে লক্ষ্যে পৌঁছয় সেটাই দেখার। ছেলেটি অবশ্য জিতবার জন্য মরিয়া। খুব দ্রুত খাবার খাচ্ছে ও। আমাদের এই ফুডকোর্টে যত খাবার আছে এক নিমেষে ও যেন সাবাড় করে দেবে সব। তারপর ও হয়তো কাঁচা সবজি খাবে চিবিয়ে চিবিয়ে, কাচ খাবে, পেরেক খাবে। মানুষ থেকে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত হবে ও ধীরে ধীরে। তারপর একদিন যখন ও পৃথিবীর সব মোটা মোটা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথেমেটিক্সের বই চিবিয়ে খেয়ে গজগজ ঘস্ ঘস্ করতে করতে উদ্গার তুলবে তখন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবে ওর মা-বাবা।

কিন্তু তারপর যে পাখি টুঁ-ও করবে না, টাঁ-ও করবে না। মনে হল ব্যাপারটা আটকানো দরকার। এটা অবশ্য আমার অনেকদিন আগেই মনে হয়েছিল। তখন একদিন ওকে ধাওয়া করেছিলাম ওর দৈনন্দিন জীবন পরিক্রমার উদ্দেশ্য। তাতে আমার মনে হয়েছিল ওর খুব দ্রুত একটি ল্যাজও গজাবে আর কান দুটো ঝুলে যাবে লম্বা হয়ে। ও এখানে এসেছিল মেদিনীপুরের এক গ্রাম থেকে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আইআইটির ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। বংশ মর্যাদার কৌলিন্য এখন ওর তলানিতে ঠেকেছে। ওর দাদু যজমানি করতেন আর ওর বাবা জুনিয়ার হাই ইস্কুলের মাস্টার। স্বপ্ন অনেক, সাধ্য এতটুকু। দুলাল বাবু বলতে ওর বাবাকে এলাকায় সবাই চেনে একটাই কারণে, তিনি হলেন অঙ্কের জাহাজ। ছেলেও ছিল তার বেশ তুখোড়। ভেবেছিলেন নিজের অপূর্ণ আশা পূরণ করবে তার ছেলে। তার স্ত্রী নীলাঞ্জনা আধা শহুরে আদপ কায়দায় বড় হয়েছে ফলে ছেলে নিয়ে তার আশা আকাঙ্ক্ষা তো বরাবরই একটু বেশি। ছেলে বড় হতেই তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে কষ্ট করে হলেও কলকাতার নামী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিলেন ছেলেকে। ঘর ভাড়া করে দিলেন থাকার। কোনওদিন সকাল নটা থেকে বিকেল ছটা, কোনওদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত চলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সঙ্গে স্কুল, সঙ্গে আরো আরো টিউশন। রবি থেকে রবি, না সপ্তাহের কোনওদিন নেই কোনও ছুটি, নেই কোনও অবসর। আর এই বিপুলসংখ্যক ক্লাসের বিপুলসংখ্যক এ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে শুতে শুতে তার বেজে যায় রাত আড়াইটে তিনটে। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় উঠে আবার দৌড়তে হয় টিউশন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অপেক্ষারত অসংখ্য অভিভাবকের বিষোদ্গীরণের থেকেই এসব আমার কানে আসে। এগারো-বারো এই দু'বছর এমন অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও ছেলেটি এডভান্স জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পেল না, ফলে আবার এক বছর ড্রপ, আবার প্রশিক্ষণ। এর পরেও যারা পায় না তাদের জন্য নাকি কোটাতে আলাদা ঘর আছে, ফ্যান আছে এমন কি দড়ির ব্যবস্থাও আছে, কলকাতার ইন্সটিটিউটগুলো দাবি করে তারা অনেক মানবিক, তাঁদের এখানে এমন চাপ নেই। নেই তো কি হয়েছে বাইরে চাপ তৈরি করে নেন অভিভাবকরা, এমনকি ছাত্ররা নিজেরাও।

কি করবে তারা, কি করে তারা অবসাদ কাটাবে, তারা পাশাপাশি বসে প্রশিক্ষণ নেয়, সকলেই প্রায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ধরেই নেওয়া যায় কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের বেতন-কাঠামো যা তাতে কোনও সাধারণ চাকরিজীবীর তা চালানো যথেষ্ট সমস্যার। হ্যাঁ মুষ্টিমেয় কিছু ছেলে-মেয়ে মেধার ভিত্তিতে কিছু অনুদান পায়, তাতে সামান্য কিছু কম পড়ে খরচপাতি। যেমন এই ছেলেটির ক্ষেত্রেও হয়েছিল। অথচ এখনও ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফর্ম ফিল-আপের সময় লিখতে হয় তোমার ধর্ম কি? তুমি সাধারণ নাকি তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত। আমাদের সংবিধানে নাকি শ্রেণিবৈষম্যহীন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে! সংরক্ষণের সুবিধা দিয়ে সত্যি কি একটা জাতিকে শ্রেণিবৈষম্যহীনভাবে গড়া যায়? গেছে কি এত বছরেও? বরং আরো বেশি সুবিধা ভোগী একটি প্রিভিলেজড ক্লাস তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যাও বা গেছিল যত দিন যাবে তা আর যাবে না। কেন যাবে না তার একটা সূক্ষ্ম হিসেব আছে। একদল মানুষ যারা ইতিমধ্যেই সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন উচ্চবিত্ত সমাজে তারা তাদের সন্তানের জন্য সাজিয়ে দিচ্ছেন অনেক অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা, ফলত তারা বংশপরম্পরায় ভোগ করছেন সংরক্ষণের সুবিধা আর যারা আজও পিছিয়ে রইলেন অর্থে, বিত্তে, মানে, মর্যাদায় তারা পিছিয়েই রইলেন। নির্দিষ্টসংখ্যক সংরক্ষিত আসন দখলের লড়াইয়ে তারা হেরে গেলেন পিছনে বর্ণের ধ্বজাধারী তুমুলভাবে অগ্রগামী উচ্চবিত্তদের কাছে। অথচ ওই উচ্চবিত্ত মানুষগুলো কিন্তু পিছন ফিরে আর হাত বাড়িয়ে দিলেন না সেই সব অন্ধকারে থাকা মানুষদের দিকে। আর এই সব মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষগুলোর দিকে ঘৃণা ছিটকে দিতে থাকল হতদরিদ্র সাধারণ জাতিভুক্ত মানুষগুলো। ফলে লাভের লাভ হল না কিছুই, রইল সেই শ্রেণিবৈষম্য, সেই অসাম্য। বরং অযোগ্য নিম্ন মেধার নিম্ন দক্ষতার মানুষগুলোর হাতে প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষ পড়ল এক গভীর সমস্যার মুখে। অথচ এমন নিশ্চিত ভোট ব্যাঙ্কে হাত বাড়িয়ে সত্যি কথাটা বলার সাহস দেখালেন না কেউই। এমন অসম ব্যবস্থার স্বীকার হয়ে যখন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হেরে যেতে হল ছেলেটি কে, তাকে গ্রাস করল এক গভীর অবসাদ।

এক সাইক্রিয়াটিস্ট বন্ধু ছিল আমার। বলত অবসাদ হলে মানুষ বেশি খায়। ওবিসিটি অবসাদেরই একটা লক্ষণ। আবার এই অতিরিক্ত ভক্ষণ থেকে রক্তে শর্করা বাড়তে পারে যে কোনও বয়সে, তখন ঐ শর্করাই তাকে খাবে। ছেলেটি খেত। আর ওর খাওয়া দেখলে ভয় লাগত আমার। আমি ঠাকুরকে ডাকতাম, হে ঠাকুর ও যেন কোনও বেড না পায় ঘরে, শহরের কোনও ওষুধের দোকান যেন কোনও এমন ওষুধ ওকে না দেয় যাতে ও ঘুমিয়ে পড়তে পারে চিরতরে। একদিন আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার ওয়াকারে ভর দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর টেবিলের কাছে। বললাম, আমি কি একটু বসতে পারি তোমার সঙ্গে?

ছেলেটি ভুরু তুলে তাকাল, তারপর বলল, সিওর। বসুন।

রনের সাহায্য নিয়ে আমি বসলাম ওর মুখোমুখি। বললাম, এই পিৎসাটা আমি একটু শেয়ার করতে পারি?

ওর খাওয়াতে বিঘ্ন হচ্ছিল বলে ও একটু বিরক্ত হচ্ছিল, তবু ও বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তারপর অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, হ্যাঁ কি ব্যাপার বলুন? আমি বললাম, আমাদের দেশের আইআইটিগুলো না বিশ্ব র‍্যাঙ্কিঙে একশো নম্বরের মধ্যেও নেই।

আমার কথা শুনে খানিকটা অবাক হল ছেলেটি। তারপর বলল, আপনি কি আমায় চেনেন?

মাথা ঝাঁকালাম আমি, হুঁ, অল্পঅল্প।

কি ভাবে?

এই চিনে গেলাম। হয়তো তোমাকে অনুসরণ করে।

অনুসরণ করে! ইন্টারেস্টিং।

ছেলেটি খাওয়া থামিয়েছে। আমার এটাই উদ্দেশ্য ছিল। বললাম ঐ টি কর্নারটা আমার। তুমি এতদিন এখানে আস আমাকে লক্ষ্য করনি!

ছেলেটি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ও তাই? লক্ষ্য করিনি। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট যে আইআইটি-তে সেটা কি করে জানলেন?

বললাম, তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে আসতে দেখি। একদিন গাড়ি করে তোমার ইনস্টিটিউশনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমায় ঢুকতে দেখলাম সেখানে।

সরল ভাবে ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, ও। আপনার ও কি সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজিতেই ইন্টারেস্ট?

মলিন হাসলাম আমি, বললাম, ছিল। কিন্তু শরীরের উপসর্গ ঠেলতে ঠেলতে বড় কিছু স্বপ্ন দেখা আমার আর হয়ে ওঠেনি। তবে এখন মনে হয় ভাগ্যি, ভাগ্যি আমি পঙ্গু ছিলাম না হলে সুযোগ পেয়ে মা-বাবা আমার ঘাড়ে এমন বোঝা চাপাত যে আমি এমনিই পঙ্গু হয়ে যেতাম। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি জানি ছেলেটি কি ভাবল। ভাবল পঙ্গুত্ব আমি এত সহজভাবে গ্রহণ করেছি! বলল, কি হয়েছিল আপনার? জন্মগত?

বললাম, না, এক্সিডেন্ট। শৈশবে। স্পাইনাল কর্ডটা থেতলে গেছিল। বাঁচতামই না, বেঁচে গেছি বরাতজোরে। এখন মনে হয় একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে, সকলে কত ছুটোছুটি করে– আমার দেখেই হাঁফ ধরে যায়। আমি কেমন বসে বসে কত লোকজন দেখতে পারি। আবার দেখো রোজগারপাতিও আমি মন্দ করি না, দিব্যি আছি। কত বই পড়ি, ছবি দেখি, আরাম ই আরাম।

দেখলাম ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বললাম, তোমার মত যদি একটা বন্ধু আমি পেতাম না আমি ঠিক একটা ফিল্ম বানাতাম।

চক্‌চক্ করে উঠল ছেলেটির চোখ, বলল ফিল্ম বানাতে! পয়সা কোথায় পেতে? আর আমার মত ছেলে তোমার কি উপকার করত শুনি?

বললাম, ঐ একঘেয়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং– যেন আর কোনও পেশা নেই পৃথিবীতে। আরে ফিল্ম মেকিং পড়তে যেতে বলতাম তাকে। আমি স্ক্রিপ্ট লিখতাম।

ছেলেটি খাওয়া বন্ধ করে প্রাণখোলা হাসছে, হা হা হা, তুমি পাগলের মত বকবক করছ, তাও আমার দারুন লাগছে। আমি না সত্যিই একসময়

হ্যাঁ এই মেয়েটাই, গত পরশু কিংবা তার আগের দিন সকালে এসেছিল আমাদের এখানে। টেবিলের উল্টো দিকে বসে ছিলেন দু'জন ভদ্রলোক। ওঁরা কেবল চা নিয়েছিলেন। সম্ভবত কোনও ছোটখাট পত্রিকার ইন্টারভিউ ছিল। টিকালো নাক, বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী চোখ, লম্বাটে মুখ, সপ্রতিভ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য বিপর্যস্ত, আমার চোখ এড়ায়নি। আমি সাধারণত যখন যা দেখি তাই লিখি না।

ভাবতাম ফিল্ম মেকিং পড়ব। তোমার সঙ্গে আমার বেশ জমবে দেখছি। আমি বললাম, ধুর তুমি আইআইটি স্কলার হবার জন্য জন্মেছ আর আমি চা দোকানী, তোমার সঙ্গে আমার মেলে!

ছেলেটি বলল, আইআইটি, মাই ফুট, আমার ঘেন্না লাগে এসব। মা বাবার পাগলামির জন্য আগেরবার মোটামুটি একটা ভাল কলেজে চান্স পেয়েও ভর্তি হতে পারলাম না। এবার ভাবছি আর পরীক্ষাই দেবো না। এই বলছ? সত্যি এপ্লাই করব গো পুণেতে?

এই রে! এবার আমার বুক ধ্বক করে উঠল, এতটা অন্যায় করা কি ঠিক হবে আমার ওর মা বাবার সঙ্গে। তাদের ও তো স্বপ্নের একটা ব্যাপার আছে। বললাম, তাড়া কি? সময় নাও। দেখো না এবার কি হয়, জান লাগিয়ে একবার খেটেই নাও। হলে ভাল, না হলে আরো ভাল। আমি তো রইলামই। দু'জনে মিলে যুক্তি করে তখন কিছু একটা ঠিক করা যাবে। তবে তুমি আইআইটি পেলেও মন্দ হবে না। যদি একটা লামসাম টাকার চাকরি বাগাতে পার তাহলে আর প্রডিউসারের পিছনে ছুটতে হয় না। ছেলেটি মোবাইল বার করে বলল, তোমার ফোন নাম্বার দাও। আমি ফোন নাম্বারটা বলে, গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, একটা কথা বলব?

ছেলেটি মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, বল। বললাম, যতটা পারো টাকা জমাও। অত খেয়ে খেয়ে পয়সা নষ্ট কোরো না। ভাবছি দু'জনে মিলে ভাল একটা ক্যামেরা কিনলে কেমন হয়! ছেলেটি যেন লাফিয়ে উঠল, ঠিক বলেছ তো, গুড আইডিয়া। ইস্ যদি কিছুদিন আগে বলতে। বাবার প্রতি রাগে রাগে কত টাকা যে আমি খেয়ে নষ্ট করেছি বই কেনার নাম করে!

ওর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলাম আমি। বললাম, চলে এসো মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে। টেবিলে নয় আমার টি কর্নারের ভেতরে গিয়ে বসবে পরদিন থেকে।

ছেলেটি বলল, ডান। তুমি আমার জীবনটাই পাল্টে দিলে মনে হচ্ছে। তোমার কোনও দরকার হলেও আমাকে ডেকে নিও কিন্তু আমার ফোন নাম্বার তো রইল তোমার কাছেই।

ছেলেটি চলে গেল। শীর্ষ। ছেলেটির নাম দিলাম আমি। দেহের উর্ধ্বাংশে ভর দিয়ে ওয়াকারের সাহায্যে শরীরটাকে টেনে টেনে আমি ফিরে এলাম আমার ডেরায়। খসখস শব্দ করে বোতাম টিপে ফেনা তুলে তৈরি হচ্ছিল এস্প্রেসো কফি কিংবা এলাচের গন্ধ ছড়ানো ঘন দুধ-চা। আমার তৃপ্তি আমার বেঁচে থাকার আনন্দ। এই ফুডকোর্টটা ছিল বলেই না আমি বুঝতে পেরেছিলাম ব্রেড বাটার কিম্বা যৌনাকাঙ্ক্ষার বাইরেও মানুষের জীবনে কত উত্থান পতন আছে, পাওয়া না পাওয়া আছে। কত ভালবাসা, কত ঘৃণা, কত সুখ, কত অসুখ নিয়ে চলমান এই জীবন।

এগার.

সকাল বারোটা। বিজয়ার পর সবে খুলেছে আমাদের ফুডকোর্ট। ঝাড়-পোঁছ চলছে। দেওয়ালের জায়েন্ট স্ক্রিনে তখনও প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবি। জলে ভাসমান ডুবন্ত মা দুর্গার মুখ। বেশ একটু ঢিমে তেতালায় শুরু হয়েছে দিনটা। যদিও একটু পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে দেওয়ালির ভিড়। এটা উৎসবের মরশুম। এক আনন্দ শেষ হতে না হতে এসে পড়ে আর একটা।

অনেকদিন পরে খবরের কাগজ এসেছে। যতই টিভিতে খবর শুনি না কেন, খবরের কাগজ না দেখলে যেন সকালটা শুরুই হয় না ঠিকভাবে। আজকাল খবরের কাগজের অপিসেও ছুটি থাকে বেশ কয়েকদিন কিন্তু আমাদের কোনও ছুটি নেই। উৎসবের দিনেই তো মানুষ খাওয়া দাওয়া করবে বেশি করে। শুধু একাদশীর দিনটা ছুটি ছিল। আমি অবশ্য নবমীর দিনও আমার টি কর্নার খুলিনি। ডিস্এবেল সোসাইটি থেকে আমাদের পুজো পরিক্রমায় নিয়ে গিয়েছিল। ওফ্ কত টাকা যে মিস্ ইউজ হয় এই পুজো উপলক্ষ্যে। হ্যাঁ উৎসব আমার মন্দ লাগে না তবে এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়িটাও আমার পছন্দ না।

খবরের কাগজটা খুলে চোখের সামনে ধরতেই ধ্বক করে উঠল আমার বুক। আমি ঝুঁকে পড়লাম কাগজের ওপরে, বড় বড় অক্ষরের হেডিং, বেলঘড়িয়ায় বধূহত্যার দায়ে ধৃত স্বামী, নীচে বেশ বড় চৌকো খোপে রঙিন উজ্জ্বল সেই বধূটির ছবি, সঙ্গে লেখা শ্বশুরবাড়ির দাবি আত্মহত্যা। আজকাল ডিজিটাল প্রিন্টিঙের দৌলতে খবরের কাগজের ছবিগুলোও এত স্পষ্ট আর জীবন্ত। মানুষ চিনতে আমার কখনও ভুল হয় না। তীক্ষ্ণ আমার অবজারভেশন পাওয়ার। হ্যাঁ এই মেয়েটাই, গত পরশু কিংবা তার আগের দিন সকালে এসেছিল আমাদের এখানে। টেবিলের উল্টো দিকে বসে ছিলেন দু'জন ভদ্রলোক। ওঁরা কেবল চা নিয়েছিলেন। সম্ভবত কোনও ছোটখাট পত্রিকার ইন্টারভিউ ছিল। টিকালো নাক, বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী চোখ, লম্বাটে মুখ, সপ্রতিভ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য বিপর্যস্ত, আমার চোখ এড়ায়নি। আমি সাধারণত যখন যা দেখি তাই লিখি না। যা লিখতে ইচ্ছে করে তাই লিখি। ওদের দেখে আমার আলাদা করে লেখার মত কিছু লাগেনি। আর যেহেতু ওরা সকাল বেলা এসেছিল, সকাল বেলা লেখার আগ্রহ আমার একটু কমই থাকে। আমি দিনের কথা দিনেই লিখি, বড়জোর রাতটুকু লিখে শেষ করি। পুরনো কথা মনে করে করে লেখা, ও আমার পোষায় না। সে অর্থে আমি তো লেখক নই, আমার লেখা মানে যেন শুধু সময় কাটানো, অনেকটা রিপোর্টাজ ধরনের। অথচ এই একটা হেডিং আমাকে যেন নিয়ে গেল ফ্ল্যাশব্যাকে।

উঁহু পরশু বা তার আগের দিন না, মনে পড়েছে সপ্তমীর দিন সকালে এসেছিল মেয়েটি। পুজোর সকাল, রোদটা যেন একটু বেশিই উজ্জ্বল ছিল সেদিন। সাদা লালে চেক চেক একটা তাঁতের শাড়ি, লাল ব্লাউজ, গলায় সরু লাল ট্রাসেলের সঙ্গে ছোট্ট সোনালি লকেট। দিব্যি দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। সপ্রতিভতা দিয়ে যেন ও ঢেকে রেখেছিল ওর অস্বচ্ছল বাস্তব। এমন মানুষজন এখানে প্রচুর আসেন। একটু আনন্দ করতে এখন সকলেই চান। হোক না বাড়ি গিয়ে ডাল ভাতই খেলাম, হোক না ঘরের জামাটা মলিন, সে তো আমার ভেতরের পৃথিবী, ক্ষণিকের জন্যও কি আমি ভেসে উঠতে পারি না আমার নিমজ্জিত অন্ধকার থেকে! পারি না কি ভাবতে হরিপদ কেরানীর সঙ্গে আকবর বাদশার কোন ভেদ নেই! আমার মনে হয়েছিল এই মেয়েটিও বুঝি তেমনই।

সম্ভবত মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছিল কর্তৃপক্ষের। সম্ভবত চাকরি পাকা হয়েছিল মেয়েটির। ভদ্রলোক দুজন যখন আমার কাছে চা নিতে এসেছিলেন তখন ওদের জামায় আমি লক্ষ্য করেছিলাম ওঁদের লোগো, ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন বলেই বোধহয় ওঁদের কাগজের লোগো আঁটা সার্ট পরে ওরা এসেছিলেন। ওঁদের ভেসে আসা টুকরো কথোপকথনের সূত্র ধরে সংলাপ সাজাচ্ছিলাম আমি। আপনার এত ভাল রেজাল্ট। এমএ-তে ফার্স্ট ক্লাস। তবু অন্য চাকরির চেষ্টা করেননি আপনি?

তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কি আর চেষ্টা না করে বসে আছি স্যার। অনেক চেষ্টা করেছি, স্কুল, কলেজ, সরকারি, বেসরকারি।

আমাদের নতুন কাগজ, মাইনে কিন্তু অতি সামান্য।

আমি তো জেনেই এসেছি স্যার।

তবে সারকুলেশন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতন কাঠামোর পরিবর্তন হবে

আশা করা যায়। আপনাদের মত ব্রাইট মেয়েরা সঙ্গে থাকলে কাগজটা দাঁড়িয়ে যাবে আশা করি।

আমি যথাসাধ্য করার চেষ্টা করব।

খবরের কাগজের চাকরি, সময়ের কিন্তু অত বাঁধাধরা হিসেব নেই।

জানি।

বাড়িতে কোন সমস্যা হবে না তো?

হলে মানিয়ে নেব, আমি দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে জানি।

বাঃ। তবে ওভার টাইমের জন্য আমরা কিছু পে করার চেষ্টা করব। আমাদের ফাইনান্স করবেন যাঁরা তাঁরা কিন্তু বেশ নামী সংস্থা, তবে তারা হিন্দি ইংরেজিতে বেশি আগ্রহী। ভারনাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে বিনিয়োগ করতে চান না। আমাদের আদায় করে নিতে হবে। আপনি কিছুদিন ধরে সমস্ত লিডিং কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ুন।

ঠিক আছে স্যার।

পুজোর পরেই আমরা জয়েনিং লেটার পাঠিয়ে দেব আপনাকে। তবে প্রথম প্রথম কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রাগল করতে হবে আপনার। এই মুহূর্তে আমাদের কিছুই নেই সেভাবে। মৌলালীর কাছে একটা ছোট্ট ভাড়া করা অপিস। ক'টা কম্পিউটর।

মেয়েটি এবার হাসল, বলল, স্যার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কাজ করতে পারব, কত বড় বড় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারব, এত আমার কাছে স্বপ্নের মত। একে স্ট্রাগল কি বলছেন! কোনও জিনিসকে গড়ে তোলায় যে কি আনন্দ। স্ট্রাগল করেছি আমি আমার ছোটবেলায়, আপনি আমার বায়োডাটা দেখেননি। আমার বাবা ছিলেন সামান্য রাজমিস্ত্রি। মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের তিনটি বিষয়েই নব্বইয়ের ওপরে নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও বাংলা পড়েছি শুধুমাত্র টাকার অভাবে। তবে বাংলা বিষয়টা বরাবরই আমার খুব পছন্দের বিষয় ছিল। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আমি সমস্ত পত্রপত্রিকাই নিয়মিত পড়তাম। তারপর স্ট্রাগল করছি এখনও হয়তো-বা।

খবরের কাগজের প্রয়োজনীয় আভিজাত্য মেনে ভদ্রলোক দু'জন আর কথা এগোলেন না শুধু নমস্কারের কৌলিন্য ভেঙে হাত বাড়িয়ে দিলেন শেক করার জন্য। মেয়েটিও খুশি মনে নিজের হাতটি তুলে দিল ওঁদের হাতের মুঠিতে। চোখ কড়কড় করছে আমার। ঐ মেয়ে আত্মহত্যা করতেই পারে না। ও যে দু'চোখে স্বপ্ন নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল ক'দিন আগে, ধরা পড়েছে ওর স্বামী ও শ্বশুর। মেয়েটির সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন, মাথায় গভীর ক্ষত। আবার তাকাই মেয়েটির ছবির দিকে। গভীর স্বপ্ন মাখা দুই চোখ। প্রেমের জন্য এ মেয়ে যেন সব দিতে পারে। আকুল করে ভালবাসতে পারে ও ওর প্রেমার্থীকে। রাধাকুলে জন্ম যেন ও বোকা মেয়ের। ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল উচ্চমাধ্যমিক পাশ একটা সরকারি হাসপাতালের টেকনিশিয়ানকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে ট্রেনেই আলাপ। শিক্ষাগত যোগ্যতাই একটা মানুষের একমাত্র মাপকাঠি নয়, ছেলেটি খুব ভাল গান গায় যে। অকুল দরিয়ায় তরী কুল নাই রে। গাঙে ডুবে মরেছিল মেয়েটি। কিন্তু সাত পাক ঘুরতে না ঘুরতেই উন্মোচিত হলো ছেলেটির বর্ণাঢ্য জীবন। তিনি গাঁজা ভাঙ মদ খেয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হুল্লোড় করে উড়িয়ে দেন বেতনের সমস্ত পয়সা আর প্রতিবাদ করতে গেলেই মেয়েটির কপালে জোটে বেদম প্রহার। ক্রমেই যেন ওঁদের একসঙ্গে বসবাস অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। মেয়েটির টিউশনি করে জমানো পয়সাও কেড়ে নিয়ে চলে যেত ছেলেটি।

মেয়েটি ঠিক করল আর নয়, এবার তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। মরিয়া হয়ে উঠল একটা চাকরির জন্য। এখান থেকে পালাতে হবে তাকে। আর যেদিন জানিয়ে দিল তার চাকরি প্রাপ্তির খবর সেদিনই ওর জীবনে নেমে এল যবনিকা। খোলা কাঠারি নিয়ে ছেলেটি চড়াও হল মেয়েটির ওপর। পরিণতি এই মৃত্যু। আমি হাতের ভেতর দলা পাকাচ্ছিলাম কাগজটা। ও পালাতে পারল না! ও কি আমার মত পঙ্গু! আমি যদি আমার এই অসাড় দুটো পা নিয়ে লড়াই করতে পারি সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে তবে ও কেন পারল না? কেন হেরে গেল? কেন ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিল না ছেলেটির! ওর শক্ত দুটো হাত, সবল দুটো পা! তবু কি ভাবে ওকে ওরা মেরে ঝুলিয়ে দিল ফ্যানের সঙ্গে? হয়তো বাধা দিয়েছিল, তাইতো ওর সারা অঙ্গে অমন কালসিটে। হয়তো সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি মেয়েটি। আমার ফুডকোর্টের দেওয়াল জুড়ে তখনও বিসর্জনের ছবি। আমি চিৎকার করে বললাম, স্ক্রিনের ছবিটা পাল্টে দাও।

মেয়েটি কোনও টেবিলে বসেছিল আমার ঠিক মনে নেই। তাই এই অধ্যায়ের নাম দিলাম আমি শূন্য অথবা টেবিল নাম্বার নীল। আজ আর আমি কিছু লিখব না। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর আমি আর ঘাটের দিকে চাই না। অমন সোনার বর্ণ প্রতিমার বর্ণহীন ছেঁড়া কাঠামোর দিকে তাকানো যায় না। খড় বিচালি কাঠ, গলে যাওয়া কাদা। কোথায় বিশ্বাস, কোথায় আবেগ? ডাম্পারে বোঝাই হচ্ছে যত আবর্জনা, পচা ফুল, শুকনো বেলপাতা। তাই দেখতেও এত লোক ভিড় করে ঘাটে! ঢাক বাজে, মাইক বাজে, বাজে কাড়া নাকাড়া, যেমন বাজত সতীদাহের সময়!

কাগজওয়ালা নতুন লোক পাবে। আমি জানি ছাড়াও পেয়ে যাবে ধৃত ওর স্বামী। ওর রাজমিস্ত্রি বাবা, ছুতোর মিস্ত্রি ভাইয়ের সাধ্য কি কেস লড়ার? আর লড়াই করে হবেই-বা কি? ও কি আর ফিরে আসবে? এমন যুক্তি তো সাজানোই আছে ওর জন্য সবার মুখে মুখে। একাকী উদাস মেয়েটি চিৎ সাঁতারে স্বর্গে গিয়েছে। ওর জন্য একদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতার হেডিংই যথেষ্ট। এই ভেবে আমি আজ সকাল সকালই ফাইল বন্ধ করে দিই। নীরবতা পালন ছাড়া আমার আর কিই বা করার আছে।

বারো.

পাখির বাসা। আজ আর কোনও একটা টেবিল নয় পুরো এলাকাটারই দখল নিয়েছে ওরা। কলবল করে ঢুকে পড়েছে। ওরা পথশিশু। শিশুর এ্যাডজেকটিভ দেখে মূর্ছা যেতে হয়। অনাবিল, নিষ্পাপ এসব ঢেকে দিয়ে ওরা পথশিশু। ব্যাসবাক্যে পথে থাকে যারা। কিন্তু ওঁদের গায়ে আজ ঝলমলে পোশাক। ওদের নাক দিয়ে পোটা পড়ছে না, ওদের ছেঁড়া জামা কাঁধ দিয়ে ঝুলে পড়ছে না, ওরা ডেনড্রাইট খেয়ে ধুঁকছে না। ওরা আজ কি খুশি! বিজয়া সম্মেলনীর হাট বসেছে আজ ওদের। পাখির বাসা নামে একটি নন গভর্মেন্ট অরগানাইজেশন ওদের নিয়ে ঠাকুর দেখিয়েছে, নতুন জামা কাপড় দিয়েছে, বিজয়া সম্মেলনী করছে।

বাচ্চাগুলো আজ টগবগ করছে যেন। ওরা আজ যার যা খুশি খেতে পারে। পারে বলেই যে ওরা গবগব করে খুব খাচ্ছে এমন না। জায়গাটা ঘুরে দেখতেই ওরা ব্যস্ত। কত ধরনের খাবার, তাদের কত রকমের বর্ণ, কত রকমের সুবাস। আঃ বুক টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে ওরা কেউ কেউ। নতুন জামার ফ্রিলে ঢেউ তুলে কেউ-বা ঘুরে নিচ্ছে খানিক। বাইরে তখন একটু একটু করে খররৌদ্র হিমেল হচ্ছে। মৌটুসি, বাবান, ঋতম, আর বাণ্টি বসেছে আমার টি কর্নারের একদম সামনের টেবিলটায়। টেবিল নাম্বার এক। ওদের কথা শুনে আমি হেসে বাঁচি না।

মৌটুসি নাকি মুম্বই যাচ্ছে হিন্দি ফিল্ম করতে। ওর সঙ্গে সিনেমাওয়ালাদের কথা হয়ে গেছে। শুধু আর একটু লম্বা হবার অপেক্ষা। বাবান তো পুলিশ হচ্ছেই, খচ্চর শিবা যে কিনা ওর বাবাকে মেরে ফেলেছিল আর এখন হাতিবাগানে জামার দোকান দিয়ে সাধু সেজেছে তাকে একেবারে নাইন এমএম দিয়ে টিচ ক্যাও। ঋতম হবে ব্রেক ডান্সার। গলার চেন তুলে তিনবার কপালে আর ঠোঁটে ঠেকাল সে লকেটে আঁটা মহাগুরু মিঠুন চক্কোবর্তীর ছবি।

বাণ্টির ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। আমি যেমন ওকে দেখছিলাম ও-ও তেমন সরাসরি দেখছিল আমাকে। বেশ অদ্ভুত লাগছিল আমার। এতদিন এভাবে আমাকে কেউ দেখেনি বরং আমিই দেখেছি সবাইকে। কিছুক্ষণ বাদে আকাশের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে আর তুড়ি মারতে মারতে এগিয়ে এল ছেলেটি। আমি বললাম, কি লাগবে চা না কফি। ছেলেটি শিষ দিতে দিতেই আস্তে করে বলল, পুরিয়া আছে?

আমি ফিস ফিস করে বললাম, ছিল ফুরিয়ে গিয়েছে।

কত করে দিচ্ছ?

ফুরিয়েই যখন গিয়েছে তখন দাম বলে কি হবে। তাছাড়া আজ তো তোমাদের সঙ্গে দিদিমণি আছে।

তো? রানাদা বলেছে সব জা'গাটাই বাজার, ধরতে পারলেই হল। এদের একদিনের দয়া নেওয়ার থেকে মরে যাওয়া ভাল। আমি একদিন এই পুরো জায়গাটারই মালিক হব।

অবাক হয়ে তাকাই ছেলেটির দিকে। নাকের নিচে এখনও ভাল করে

গোঁফ ওঠেনি, বয়স তের কি চোদ্দ, বললাম একদম ঠিক বলেছ তুমি, স্বপ্ন এমন বড় করে দেখাই উচিত। ঐ মেয়েটাকে তোমার বারের ডান্সার বানাতে পার।

ছেলেটি বলল, হেই না, ওকে কেন ডান্সার বানাব ও তো মুম্বইয়ের হিরোইন হবে আর আমি বেতাজ বাদশা।

আমি বললাম, আমি একটা সিনেমা বানাব ভাবছি, প্রডিউসার পেলেই আমি তোমাকে খবর দেব। তোমার ঠিকানাটা একটু বলবে?

চক্‌চক্‌ করে উঠল ছেলেটির চোখ, বলল, সত্যি ডাকবে?

বললাম, হ্যাঁ। ঠিকানাটা বলে যাও।

পুলিশ লেলাবে না তো?

না না, ধুর, আমি একটা পঙ্গু মানুষ , অত সাহস আমার আছে নাকি!

বলল, ধাবায় ঐ একটা মস্ত বড় টাওয়ার আছে না তার নীচটায় আমরা থাকি। প্লাস্টিক গুদামের পাশে। খুব শিগগিরি আমি একটা মোবাইল ফোন কিনব তারপর নাম্বারটা দিয়ে যাব তোমায়।

আমি বললাম, বেশ। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি?

যে ক'দিন আমার ফোন না পাচ্ছ সে-ক'দিন আর ঐ পুরিয়া বেচো না। তোমাকে নায়ক বানিয়ে আমি একটা গল্প লিখব আর তুমি যদি এর মধ্যে ধরা পড়ে জেলে চলে যাও, আমার স্ক্রিপ্টের কি হবে বল তো?

বেশ চিন্তিত মুখে ছেলেটি আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, সে ঠিক আছে কিন্তু রানাদা কি ছাড়বে আমায়?

আমি বললাম, চেষ্টা কর। চেষ্টা না করলে কি বড় হওয়া যায়? তুমি সিনেমার হিরো হবে আর ভিলেনদের ম্যানেজ করতে পারবে না তা বললে কি করে হবে?

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি। ভীষণ গুরুদায়িত্ব পড়েছে ওর ওপরে। গভীর চিন্তা নিয়ে মাথা নিচু করে গিয়ে বসে পড়ল টেবিলে, যাবার আগে আমি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছি একটা আইসক্রিম কফি।

আমি মনে মনে হাসলাম, কি জানি এই সামান্য ভাওতায় ওকে ঠিক কতদিন আটকে রাখা যাবে!

কিংবা আদৌ যাবে কিনা। তবে পাখির বাসার দিদিমণিকে আমি খবরটা জানিয়ে দেব নিশ্চিত। ওরা যদি কিছু করতে পারে। যে দেশে তের বছরের ফুটপাত বালিকাকে রাতের অন্ধকারে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সারারাত ধর্ষণ করা হয় এবং তারপরেও সমাজের কোনও স্তর থেকে সেভাবে কোনও প্রতিবাদ হয় না সে দেশে তো নিষিদ্ধ ধোঁয়া চোখ ঢেকে দেবে সব মানুষের এত অবশ্যম্ভাবী। একদিনের দয়া দিয়ে সত্যিই কি ঘুচবে আমাদের দেশের এই মেরুকরণ।

বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পেলেন আজ। বড় ভাল লাগছে। কালো মানুষদের বঞ্চনার গান গেয়েছেন তিনি। নোবেল কর্তৃপক্ষ বলেছেন তিনি পাঠ্য। তার গান পড়া যায়। যায়ই তো। কতটা পথ পেরোলে তবে মানুষ হওয়া যায়। হাউ মেনি রোডস মাস্ট আ ম্যান ওয়াক ডাউন বিফোর ইউ ক্যান হিম আ ম্যান। আমাদের ফুডকোর্টে আজ সারাদিন ববডিলান বাজবে।

বিশেষ কোনওদিন ছাড়া আমাদের ফুডকোর্টে বাংলা গান বাজে না। অনেকে হয়ত নাক সিটকোবেন কিন্তু সংগীতের আবার ভাষা হয় নাকি? বব ডিলান আমার অন্যতম প্রিয় কবি। গিটার হাতে তিনি মাতিয়ে দিয়েছেন পুরো পৃথিবীকে। হোয়েন আই অ্যাম অ্যালোন উইথ ড্রিমস অফ ইউ, দ্যাট ওন্ট কাম ট্রু। বাচ্চাগুলো চলে গেছে। ওদের ঝলমলে উপস্থিতি রয়ে গেছে যেন হিমেল হাওয়ায়। ঠাণ্ডা হচ্ছে চারিপাশ। পুজো কাটতেই ঝপ করে গরম কমে গেছে অনেকটা। ধীরে ধীরে এসির ঠাণ্ডাটা কমাতে হবে। যত রাত বাড়ছে আমাদের ফুডকোর্ট চলে যাচ্ছে এক রঙিন দুনিয়ার হাতে। বব ডিলান বাজছে।

অথচ আজ সারাদিন আমার মাথার মধ্যে গুনগুন করছে একটাই গান যার সঙ্গে বব ডিলানের কোনও মিল নেই। গীতবিতান। যা আমার কাছে গানের চেয়ে বেশি পাঠ্য, সুরের চেয়ে বেশি হৃদয়ের গুঞ্জন। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে, হৃদয়কমলবনমাঝে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আসছে লাইন দুটো। যেন আমায় পাগল করে দিচ্ছে। কেন? কেন আমি জানি না, গুগুল-এ গানের লিরিকস ওপেন করলাম, জানা কথা তবু আবার পড়লাম। ছড় টেনে কে গাইছে আমার বুকের ভিতরে এই গান? নিভৃতবাসিনী বীনাপাণি অমৃত মুরতি মতি বাণী/ হিরণ কিরণ ছবিখানি– পরানের কোথা সে বিরাজে।

একটা কষ্ট একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে ঢুকে যাচ্ছে বুকের ভেতরে। আমার কান্না পাচ্ছে। শুধু কান্না পাচ্ছে আমার। আর পাঁচটা মানুষের মত কেন বাঁচতে পারলাম না আমি? কেন আমার জীবনের সোনালি সময়গুলোতে মরা প্রজাপতির মত পড়ে থাকতে হল আমায়? কেন একটা উন্মত্ত দানব গুঁড়িয়ে দিল আমার মেরুদণ্ডের হাড়গুলো? কেন আমি এত বড় জীবনেও জানব না প্রকৃত সঙ্গম কাকে বলে? কেন শুধু সাইবার, সাইবার, শুধু কল্পনা? পাগলের মত ভালবাসতে পারি আমি কেন আমি সেকথা বুঝাতেই পারব না কাউকে? কেন আমার যাবতীয় আবেগ পুরনো পোস্ট কার্ডের মত রয়ে যাবে কাগজের ফাঁকে? এখন কম্পিউটারে লিখি তাই, না হলে আগে যখন কাগজে লিখতাম, লিখতাম আর কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। এখন অভ্যাসবশতই সেভ বটনে চলে যায় আঙুল। ফিরে ফিরেই নিজের লেখাগুলো দু'একবার পড়ি তারপর ডিলিট করে দিই। তবে বেশ কিছুদিন হল লেখাগুলো আর ডিলিট করা হয় না, অনেক লেখা জমে গেছে ফাইলে। ডিলিট করতে গেলেই কেমন যেন মায়া লাগে। মনে হয় থাক আর কিছুদিন। মায়া। বাবা মারা যাবার পরও আমি আমার মোবাইল থেকে বাবার ছবি আর ফোন নাম্বার মুছে দিতে পারিনি। মনে হয় যদি কখনও কথা বলে ওঠে! অথচ এই আমিই অবলীলায় আমার জীবন থেকে মুছে দিয়েছিলাম ঋতুপর্ণার নাম। দয়া আমি সহ্য করতে পারি না।

কি মুশকিল গানটা থেকে তো বেরতেই পারছি না আমি। সম্প্রতি কি কোথাও গানটা শুনেছি আমি? না তাও না। তবে? এসো দেবী, এসো এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে– কাঁদাবে বলে নাছোড় এই গানটা কেন শুধু শুধুই আমার চোখের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে? কেন ইচ্ছে করছে পাগলের মত ভালবাসতে কাউকে? পাগলের মত ভালবাসতে ইহজীবনে কে না চায় বল? কিন্তু পারে কি সবাই? পারে কি ভ্যানগখের মত ভালবাসায় উন্মাদ হয়ে যেতে?

ধুর কি যে সব আবোল তাবোল ভাবছি। এ্যাসাইলামে বসে ভ্যানগখের কি সব অসাধারণ কাজ। মোটেই তিনি এমন কিছু পাগল হননি। সব গল্প কথা। ঐ সব ব্যাতিক্রমী মানুষগুলোকে সমাজ চিনতে পারে না, বাঁধা গতে মিলাতে পারে না তাই তাদের পাগল মনে হয়। নাঃ ব্যবসাটা মন দিয়ে করতে হবে। বাবার কথাটা রাখতেই হবে। চা কফিতে আরও নানান রকম ভ্যারাইটি আনার কথা ভাবছি। যে কোনও কাজকেই শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় যদি তার প্রতি ভালবাসা থাকে। কোন ব্র্যান্ডের আন্ডারে আর না নিজের কাজ দিয়ে নিজেই একটা ব্রান্ড হয়ে উঠতে হবে আমাকে। স্টিফেন হকিংস ঐ বাঁকাচোরা শরীরটা নিয়ে বিগব্যাঙ ঘেঁটে দিতে পারছেন আর আমি সামান্য ব্যবসাদার হয়ে উঠতে পারব না? কারোর জন্য নয় নিজের নামটা রেখে যাওয়ার জন্যই আমাকে খাটতে হবে।

● পরবর্তী সংখ্যায়

অনিন্দিতা গোস্বামী ভারতের কথাসাহিত্যিক

অনিন্দিতা গোস্বামী

জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। বিদ্যালয়জীবন থেকে কবিতা লেখার শুরু। ১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রথম কবিতার বই। ২০০৬ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকার* 'নবান্ন'তে গল্প প্রকাশের মাধ্যমে গদ্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন দেড় শতাধিক গল্প। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস। প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিতও হয়েছে অনেক গল্প। প্রকাশিত হয়েছে গল্প সংকলন। *আনন্দ পাবলিশার্স* থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুবৃহৎ উপন্যাস *অববাহিকা*। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারো। বর্তমান নিবাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কল্যাণীতে।

ফিস কারি

হেঁসেলঘর

ভোজনরসিকদের স্বর্গ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

চারপাশে জলবেষ্টিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সামুদ্রিক খাবারের ভক্তদের স্বর্গ। কাঁকড়া, চিংড়ি, গলদা ও সব ধরনের মাছ এখানে পওয়া যায়। সামুদ্রিক খাবার যদি আপনার পছন্দ না হয়, অনায়াসেই নিরামিষ খাবার বেছে নিতে পারেন। যেটুকু জমি আছে, সেখানে স্থানীয়রা ধানচাষ করে। এ কারণে ভাত এ দ্বীপপুঞ্জের প্রধান খাবার। এখানে আম, কলা, আনারস, এবং অতি অবশ্যই নারকেল প্রচুর জন্মে।

আন্দামান মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্র হওয়ায় এখানে দক্ষিণ ভারতীয়, বাঙালি, অন্ধ্র প্রভৃতি পদের খাবার পাওয়া যায়। কেরালার রান্নায় নারকেল, মসলা আর নারকেল তেল ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য জায়গার মত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও পর্যটকদের রুচি মোতাবেক খাবার-দাবার প্রস্তুত করা হয়। কাজেই উত্তর ভারতীয় খাবার যেমন নান, পরোটা, মোগলাই খানা এবং চাইনিজ খাবারের যথেষ্ট চল আছে। হ্যাভলক ও পোর্ট ব্লেয়ারের আশেপাশে এসব খাবারের অনেকগুলো জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ আছে।

চিলি কারি

মাছের ঝোল

চিকেন টিক্কা মসলা

দক্ষিণ ভারতীয় খাবার

স্থানীয়দের খাবার

স্থানীয় খাবারে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকলেও তাদের রান্নাবান্না সম্পর্কে তেমন একটা জানা যায়া না। আধুনিক সভ্য সমাজ-বহির্ভূত উপজাতীয়রা খাবারের জন্য শিকরের ওপর নির্ভশীল। কচ্ছপ, বুনো শুয়োর, নানা পদের মাছ ও জীবজন্তুর মাংস সেনটেনেলিজরা কাঁচা খেতেই পছন্দ করে, যদিও আগুনের ব্যবহার ইদানীং তারা শিখেছে। তারা বনের মধু সংগ্রহ করে। সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিমও তাদের খুব প্রিয়।

স্থানীয় উপজাতীয়দের খাদ্যবৈশিষ্ট্য রক্ষা করা

হাতে খাবার পৌঁছে দিয়ে তাদের বিগড়ে দেবার চেয়ে মানবসভ্যতার উচিত তাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে সহায়তা করা। এতে তাদের খাদ্য-শৃঙ্খলের শুধু ক্ষতি হয় না, তথাকথিত 'সভ্য খাবার' খেয়ে তারা নানারকম অসুখ-বিসুখে পতিত হয়। দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে আসা মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকুন এবং আমার আয়োজককে বিনোদনের কাজে উপজাতীয়দের ব্যবহার করায় নিরুৎসাহিত করুন। তাদের অস্তিত্ব মানবসভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আন্দামানের জনপ্রিয় স্থানীয় থালি

আন্দামান ভ্রমণপিপাসুদের অতি পছন্দের জায়গা। প্রতি বছর পৃথিবীর এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পর্যটক এখানে আসেন আন্দামানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এসব ভ্রমণকারীর অনেকে স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে চান। আন্দামানে অনেক স্থানীয় পদের খাবার আছে যার স্বাদে সত্যিই অতুলনীয়। আমরা এখানে আন্দামানের৭টি স্থানীয় জনপ্রিয় খাবারের থালি উপস্থিত করছি:

১. ফিস কারি

ফিস কারি আন্দামানের জনপ্রিয় থালি। সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় আপনি নানা পদের মাছ পছন্দ করতে পারেন। সামুদ্রিক খাবারের ভক্তরা আন্দামানের ফিস কারির স্বাদ নিতে ভুলবেন না। সামান্য তেল-মসলায় সমুদ্র থেকে ধরে আনা রান্না মাছের স্বাদই আলাদা।

২. চিলি কারি

চিলি কারি আন্দামানের আরেকটি সুস্বাদু ও সুলভ পদ। পেঁয়াজ টমেটো ও অন্যান্য চমৎকার মসলায় পাকানো এটি খুব উপাদেয় একটি পদ। অনেক বিদেশী পর্যটক আন্দামানে আসেন চিলি কারির 'গরম' স্বাদ উপভোগ করতে।

৩. মাছের ঝোল

মাছের ঝোল আন্দামানের আরেকটি জিভে জল আনা পদ। এটি মূলত বাংলার খাবার। একেক পদের মাছের সঙ্গে তেল-মসলা-পেয়াঁজ-মরিচ দিয়ে তৈরি মাছের তরকারি ভাতের সঙ্গে খেতে অপূর্ব লাগে, আবার দামেও সস্তা।

৪. চিকেন টিক্কা মসলা

আন্দামানে দাম একটু বেশি হলেও চিকেন টিক্কা মসলা এখানকার খুব জনপ্রিয় সুস্বাদু খাবার।

৫. দক্ষিণ ভারতীয় খাবার

আন্দামানের আরেকটি জনপ্রিয় পদ এখন আর শুধু দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি এখন ভারতবর্ষ, এমনকি বিশ্বের অনেক জায়গায় সুপরিচিত। আন্দামানের অনেক রেস্তোরাঁয় দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের রমরমা ব্যবসায়।

৬. চিংড়ি

আন্দামান দ্বীপনগর, কাজেই এখানে সামুদ্রিক খাবার খুব সুলভ। চিংড়ি তেমনই এক পদ– তেল-মসলায় রসারসা বা ভাজা চিংড়ির স্বাদ অতুলনীয়। আন্দামানে নানা আকারের চিংড়ি পাওয়া যায়। বিদেশীদের চিংড়ি খুবই পছন্দের খাবার।

৭. চিকেন ডিস

আন্দামানে অনেক ধরনের চিকেন বা মুরগির পদ জনপ্রিয়। চিকেন ললিপপ, বাটার চিকেন, মুর্গ মালাইওয়ালা, চিকেন চিট্টিনাড় এরকম জনপ্রিয় চিকেন পদের কয়েকটি। আন্দামানে চিকেন পদ অতিশয় সুস্বাদু। ভোজনপ্রিয় পর্যটকদের অতি অবশ্যই এসব পদ চেখে দেখা উচিত।

• অনুবাদ মানসী চৌধুরী

চিকেন ডিস

চিংড়ি

যাঁদের মনে রাখিনি...

টোকিওর রাজপথে চলতে চলতে হঠাৎ যদি এই মূর্তির নীচে চোখ পড়ে, চমকাবেন না যেন, গাউন পরা বিচারকের মূর্তির নীচে লেখা এক বঙ্গসন্তানের নাম! অথচ ভারত তো দূর, গোটা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত কিছু নেই। জাপানিরা কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরেও ভোলেনি তাঁর অবদান। দিনটা ছিল নভেম্বরের ১২ তারিখ, সাল ১৯৪৮। টোকিওর উপকণ্ঠে এক বিশাল বাগানবাড়িতে চলছে বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়া জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোসহ মোট পঞ্চান্নজন অপরাধীর বিচার। এদের মধ্যে আঠাশজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'এ' শ্রেণির শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের দায়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে, প্রমাণিত হলে যার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সারা বিশ্ব থেকে আগত এগারোজন বাঘা বাঘা জুরি অপরাধীদের দেখে একে একে ঘোষণা করছেন 'গিল্টি... গিল্টি... গিল্টি।' হঠাৎই বজ্রনির্ঘোষে একজন বলে উঠলেন, 'নট গিল্টি'।

হলঘরে নেমে এল ভয়ংকর এক নিস্তব্ধতা। কে এই জুরি মহোদয়?

পুরো নাম ডক্টর রাধাবিনোদ পাল। টোকিও যাবার আগে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি, দু'বছর উপাচার্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

১৮৮৬ সালে পূর্ববঙ্গের কুষ্ঠিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এই বঙ্গসন্তান। ছোটবেলাতেই পিতৃহীন হবার পর মা ছেলেকে নিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের চুয়াডাঙ্গা নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। খাওয়া-থাকার বিনিময়ে মা করত গেরস্ত বাড়ির কাজ আর ছেলে গরু নিয়ে মাঠে চরাতে যেত।

গরু চরানোর সময় সেই ছেলে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশেপাশে ঘোরাফেরা করত আর রোজই শিক্ষক ক্লাসে গেলে স্কুল ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখত। একদিন শহর থেকে ইনস্পেক্টর বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের কটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সকলেই চুপ, এরই মাঝে ক্লাসের বাইরে জানালা দিয়ে শোনা গেল সেই রাখালের কণ্ঠস্বর... 'আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর জানি।' ডেকে ভেতরে নিতে একে একে সকল প্রশ্নের জবাব দিল সে। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন ক্লাসে পড়?' 'আমি তো পড়িনে, গরু চরাই।' – বাখালবালকের এমন কথা শুনে তিনি তো হতবাক। প্রধান শিক্ষককে ডেকে তাকে স্কুলে ভর্তি করে নেওয়ার নির্দেশ দেবার পাশাপাশি জলপানিরও ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

সেই শুরু... রাধাবিনোদ এরপর জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক নিয়ে এম এসসি করার পর ফের আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন ও ডক্টরেট উপাধি পান। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই বিষয় বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গে বলতেন, 'আইন ও অঙ্ক তেমন একটা প্রথক বিষয় নয়।'

ফিরে আসি আবার টোকিওর আন্তর্জাতিক আদালতে। ডক্টর পাল তার অকাট্য যুক্তি দিয়ে বাকি জুরিদের বোঝান যে মিত্রশক্তিও আন্তর্জাতিক আইনের সংযম ও নিরপেক্ষতার নীতিমালা লংঘন করেছে। তাছাড়া জাপানের আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে তারা মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টিকারী দু'দুটো আনবিক বোমা ব্যবহার করে হত্যা করেছে কয়েক হাজার নিরপরাধ মানুষকে। বারোশো বত্রিশ পাতা জুড়ে লেখা সেই রায় দেখে অধিকাংশ জুরি অভিযুক্তদের 'এ' শ্রেণি থেকে 'বি'-তে নামিয়ে আনেন, রেহাই পান তারা মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে। আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর এই রায় তাকে এবং ভারতকে বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি এনে দেয়।

জাপান কিন্তু ভোলেনি এই মহান মানুষটির অবদান। ১৯৬৬ সম্রাট হিরোহিতো তাঁকে সে-দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'কোক্কো কুনশাও' সম্মানে ভূষিত করেন।

টোকিও এবং কিয়াটোতে দুটি ব্যস্ত রাস্তা তাঁর নামে রাখা হয়েছে। আইন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁর লেখা রায়। টোকিওর সুপ্রিম কোর্টের সামনে বসানো আছে তাঁর গাউন পরা মূর্তি।

● সংকলিত

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আইটি শিক্ষার প্রসারে ভারতীয় হাই কমিশনের উপহার

বারিধারা ফাউন্ডেশান পরিচালিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আইটি শিক্ষার প্রসারে ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা কয়েকটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার উপহার দেয়

বাংলাদেশ নৌবাহিনির জাহাজ বিএনএস প্রত্যয়কে ভারতীয় নৌবাহিনির আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনির জাহাজ বিএনএস প্রত্যয় আবু ধাবিতে অনুষ্ঠেয় আইডেক্স ২০২১-এ যোগদানের পথে মুম্বইয়ে যাত্রাবিরতি করে। ভারতীয় নৌবাহিনি বাংলাদেশের জাহাজটিকে কঠোর কোভিড প্রটোকল মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানায়

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, February 2021

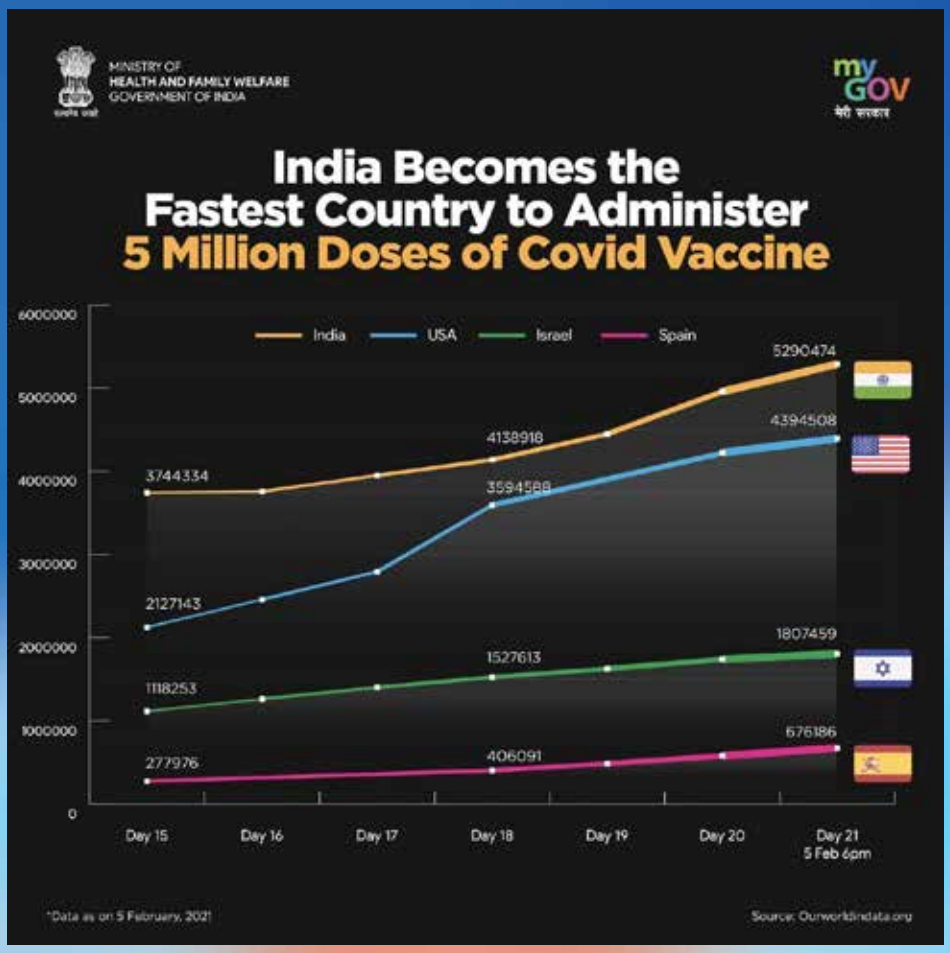

ভ্যাকসিনমৈত্রী

ভারত এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনমৈত্রী প্রকল্পের অধীনে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনগুলির মোট ২২৯.৭ লক্ষ ডোজ সরবরাহ করেছে। উপহার হিসাবে ৬৪.৭ লক্ষ ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ১৬৫ লক্ষ ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে। ভ্যাকসিন মৈত্রী উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে আরও জোরদার করছে।

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ইন্‌স্টাগ্রাম ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in /IndiaInBangladesh

@ihcdhaka /hcidhaka /HCIDhaka